৫

ইসলামী রাষ্ট্রদর্শন

ভূমিকা: মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্যই রাষ্ট্রচিন্তার উদ্ভব। রাষ্ট্র কি ধরনের হলে সমাজ ব্যবস্থা সুন্দর ও উত্তম হতে পারে তা নিয়ে যুগ যুগ ধরে চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও প্রজ্ঞাবান মানুষ চিন্তা-ভাবনা করেছেন। মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের ও সরকারের কি ধরনের সম্পর্ক হবে, আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ কি হবে এ বিষয়ে চিন্তাবিদগণ তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। মধ্যযুগে মুসলিম দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞনী ও মনীষীগণ রাষ্ট্রচিন্তার উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এদের মধ্যে মোহাম্মদ আল ফারাবী, ইমাম গাযযালী, ইমাম আবু হানিফা, ইবনে খালদুন, ইবনে রুশদ ও ইবনে সিনার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব চিন্তাবিদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানে ইসলামী ও মুসলিম রাষ্ট্রদর্শন পরিপুষ্ট হয়ে উঠে।

ইসলামী রাষ্ট্রদর্শনের বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছিল হযরত মুহাম্মদ (স:) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে। কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক রাষ্ট্রদর্শনই ইসলামী রাষ্ট্রদর্শন। মনে করা হয় যে, মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, অর্থাৎ সার্বিক মুক্তির জন্য ইসলামী রাষ্ট্রদর্শনের গুরুত্ব অপরিহার্য। শুরু থেকেই ইসলাম ধর্ম শ্রেণী বৈষম্য দূর করে মানুষকে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার দিকে উদাত্ত আহবান জানিয়েছে। আসুন আমরা ইসলামী রাষ্ট্রদর্শন শীর্ষক ইউনিটের পাঠগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- *পাঠ-১ : হযরত মুহম্মদ (সা:): ইসলামি সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার*
- *পাঠ-২ : খোলাফায়ে রাশেদীন;*
- *পাঠ-৩ : মোহাম্মদ আল ফারাবী;*
- *পাঠ-৪: ইবন্ রুশদ;*
- *পাঠ-৫: ইবন সিনা;*
- *পাঠ-৬: ইমাম গাযযালী (রহ:);*
- *পাঠ-৭: ইবনে খালদুন;*
- *পাঠ-৮: ইবনে খালদুনের ইতিহাস ও সমাজ দর্শন ও*
- *পাঠ-৯: হযরত মওলানা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রহ:)।*

পাঠ - ১

হযরত মুহাম্মদ (সা:) ঃ ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ❑ হযরত মুহাম্মদ (সা:) কর্তৃক মদীনা সনদের ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং এর ভিত্তিতে ইসলামী উম্মাহ্ ও ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ❑ মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- ❑ মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের কেন্দ্রীয় সত্য উপলব্ধি করবেন;
- ❑ খিলাফতুল্লাহ বা আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে, রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর ভূমিকা ও সাফল্য বর্ণনা করতে পারবেন;

পটভূমি

নবুওয়ত লাভের পর বহু বছর মক্কায় অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিয়ে ইসলাম প্রচারের পর আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) প্রথম হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল এবং ২৪ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে ইয়াসরীব বা মদীনায় হিজরত করেন। তখন থেকে মদীনার নাম হয় মদীনাতুন নবী। পরবর্তীকালে একে আল-মদীনা আল-মুনাওয়ারা কিংবা কেবল মদীনা বলা হতে থাকে।

৬২০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে মদীনা থেকে ৬ জন লোক রাসূল করীম(সাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ ভাবে ইয়াসরীবের মৃত্তিকায় ইসলামের বীজ রোপিত হয়। অতঃপর মদীনার খাযরাজ গোত্রের ৯ জন এবং আওস গোত্রের ৩ জন নিয়ে মোট ১২ জন মুসলিম মক্কায় রাসূল করীম (সা:)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এটি 'আকাবার প্রথম শপথ নামে পরিচিত'। অতঃপর আকাবার শেষ বৈঠক বা দ্বিতীয় শপথে ৭৫ জন মুসলিম অংশ নেন। এ সময় তারা রাসূলুল্লাহ(সাঃ)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তাঁর নেতৃত্বে লড়াই করার এবং কাফিরদের মোকাবিলা করার ওয়াদা করেন। একে 'বায়াত-উল-হারব' বা যুদ্ধের অঙ্গীকার বলা হয়। এর মধ্যে প্রতিরক্ষার পাশাপাশি শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণের অঙ্গীকারও ছিল। এটি চুক্তির উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম উম্মাহ্র ভিত্তি কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়। সুপ্রাচীনকাল থেকে হিলফ, জিওয়ার ও বিলা ইত্যাদি রক্ত সম্পর্ককে পরিত্যাগকরতঃ ঈমানের ভিত্তিতে 'মুআখাত' বা ভ্রাতৃসম্পর্ক গড়ে উঠে আনসার ও মুজাহিদদের মধ্যে। আল কুরআনের আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামী উম্মাহ্ নির্মিত হয়। রাসূল করীম (সা:) মদীনায় হিযরতের পর 'মুআখাত' নতুন মাত্রা পায় এবং ৬২৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে এটি মুহাজির ও আনসারদের ভিতর ফলপ্রসূ হয়।

মদীনা সনদ, ইসলামী উম্মাহ্ ও ইসলামী রাষ্ট্র

রাসূল করীম (সা:)-এর মদীনায় হিজরতের পর একদিকে যেমন ইসলামভিত্তিক মুসলিম উম্মাহ্ গঠিত হয় অন্যদিকে তেমনি ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিও প্রতিষ্ঠা পায়। রাসূল (সা:)-এর মদীনায় গমনের অব্যবহিত পরেই মুআখাত-এর ক্রমধারায় তাঁর কিতাব বা মদিনা সনদ জারী করা হয়। এটি ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে স্বীকৃত। মুআখাতে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রকাশ স্পষ্ট আর মদীনা সনদে ইসলামী বা মুসলিম উম্মাহর ভিত্তি প্রকাশিত। কিন্তু মদীনা সনদে সেই সঙ্গে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে জনগণকে মদীনার নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মদীনা সনদের ভিত্তি আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস, রাসূলুল্লাহ(সাঃ)-এর নেতৃত্ব ও প্রাধান্য এবং ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কাঠামোর স্বীকৃতি-নির্ভর।

মদীনা সনদে খুবই পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে ঃ পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে। এ সনদ আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রণীত। এর আওতাধীন হচ্ছে কুরাইশ মুসলিম ও ইয়াসরীবের সকল বিশ্বাসী ও মুসলিম এবং যাঁরা তাঁদের অনুসারী এবং এ ভাবে যাঁরা তাঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং যাঁরা তাঁদের সঙ্গে জিহাদে অংশ নেয় (দ্রষ্টব্য, ইব্‌ন ইসহাক, সীরাত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)। এ সনদের দলীলে উল্লেখিত মুহাজির ও আনসারগণকে বাকি লোকদের থেকে পৃথক করে এক ঐক্যবদ্ধ 'উম্মাত আল্লাহ্' বা আল্লাহ্‌র সমাজ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ উম্মতের এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)। এ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং এটিকে শাসনের অধিকার আল্লাহ্‌র এবং তাঁর নামে রিসালতের বাহক খিলাফতুল্লাহ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর। মদীনা সনদের ১,১৫,২৫ নম্বর অনুচ্ছেদ থেকে স্পষ্ট যে, একমাত্র মুসলমানরাই এ সনদের সদস্য, কেননা ইসলামী বন্ধনই উম্মাহ্‌র ভিত্তি। মুহাম্মদ ফুয়াদ আল বাকীর মতে, আল কুরআনের পরিভাষা উম্মাহ্ শব্দটি ঐ মহা গ্রন্থে ৫১ বার এসেছে এবং এর বহুবচন উমাম শব্দটি ১৩ বার এসেছে। এ উম্মাহ্ শব্দটি ৩০৩টি হাদিসে লক্ষণীয়। ওয়াট তাঁর "আইডিয়েল ফ্যাক্টরস অব দি অরিজিন অব ইসলাম"-এ স্বীকার করেছেন যে, যারা রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর বাণীকে গ্রহণ করেছে তাঁদের নিয়েই এ সমাজ গঠিত হয়েছিল। যে সব গবেষক বলেন যে, মদীনার মুসলিম, ইহুদী ও পৌত্তলিকরা উম্মাহ্‌র ভিতর ছিল, তারা কেবল মদীনা সনদেরই বিরোধী নয়, বরং ইসলামভিত্তিক উম্মাহ্‌র ধারণাকেই বিকৃত করেন। মদীনা সনদের ১ অনুচ্ছেদে আনসার ও মুহাজিরগণকেই কেবল 'উম্মাহ্ ওয়াহিদাহ্' বা এক সমাজ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। ইব্‌ন হিশামের "সীরা" গ্রন্থ(রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর জীবনী), রিউবেন লেভীর "দি স্যোশাল স্ট্রাকচার অব ইসলাম" এবং ডবি-উ. মন্টোগোমারী ওয়াটের "মুহাম্মদ এ্যাট মদীনা" গ্রন্থে এ কথার স্বীকৃতি রয়েছে।

মদীনা সনদের ১ অনুচ্ছেদে মুসলিমদের পার্থক্য নির্দেশকরতঃ এক উম্মাহ্‌র ঘোষণার অনুকূলে ১৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, বিশ্বাসীরা একে অন্যের বন্ধু (মাওয়ালী)। এক বচন মাওলার বহু বচন মাওয়ালী। মদীনা সনদের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাধীন অবস্থায় স্বীকৃতি দেয়া হলেও, নিরাপত্তা-অধিকার-মর্যাদা-স্বাধীনতা দেয়া হলেও বিশ্বাসী মুসলিমরা ছাড়া অন্যরা যে এর বাইরে তা স্পষ্ট। ২৫ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে ইব্‌ন হিশামের টেক্সক্ট(২য় খন্ড) পৃষ্ঠা ৫০১-৫০৪ থেকে দেখা যায় যে, সেখানে আছে "উম্মাতুন মা'আ আল-মুমিনিন", "উম্মাতুন মিন আল-মুমিনিন" নয়। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, বনু আওফের ইহুদীরা মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েও বিশ্বাসীদের তথা মুসলিমদের বাইরে এক আলাদা সম্প্রদায়। আরবি ভাষার পন্ডিতগণ মা'আ এবং মিন-এর তফাৎ বুঝেছেন বলে শুদ্ধ উদ্বৃতি ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইউরোপীয় ও প্রাচ্যদেশীয়রা 'উম্মাহ্' ধারণাটির ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন আরবীর ভ্রান্ত অর্থ করার কারণে।

মদীনা সনদ অনুযায়ী ইহুদীদের নিকট ইহুদীদের ধর্ম প্রবং মুসলিমদের নিকট তাদের ধর্ম ইসলাম। তাদের মাওয়ালী ও তাদের প্রতিও এটি প্রযোজ্য ছিল। গভীর ব্যাখ্যা থেকে দেখা যায়, মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমানগণ এককভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর সকল অমুসলিম, পৌত্তলিক, ইহুদী, খ্রিস্টানরা হালীফের মর্যাদা পেয়েছিল। তারা নিরাপত্তা ও সম অধিকারসম্পন্ন নাগরিকের মর্যাদা লাভ করেছিল। মদীনা সনদের ১৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ইহুদীদের মধ্যে যে বা যারা আমাদের অনুসরণ করে তাদের জন্য আমাদের সাহায্য ও সমর্থন রয়েছে। তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না কিংবা তাদের শত্রুদেরও সাহায্য করা হবে না। ২৫ অনুচ্ছেদে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদত্ত হয়েছে।

আবার ২৪, ২৭, ৩৮ অনুচ্ছেদে সর্ব ব্যাপারে মুসলিমদের সঙ্গে তাদের সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে।

মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রে ক্রিয়াশীল মদীনা সনদে ইসলামী উম্মাহ্র সঙ্গে অমুসলিমগণের সংশ্লিষ্টতার প্রধান কারণ ছিল, তারা মদীনার রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডের অধিবাসী ছিল এবং এ জন্যে তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রে আত্মীকৃত করা হয়েছিল। সংবিধান হিসেবে মদীনা সনদ মুসলিম উম্মাহ্র সকল সদস্য ও সহযোগী সম্প্রদায়গুলিকে এক ঐক্যবদ্ধ অধিকার ভোগ ও দায়-দায়িত্বে সংযুক্ত করেছিল। সাংবিধানিক অধিকার ও স্বাধীনতার স্বীকৃতি যেমন ছিল সবার জন্য, তেমনি লেন-দেন পরিশোধ, মদীনা রাষ্ট্রের অধিবাসীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, বাইরের আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষা এবং আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-এর আদেশ-নিষেধ মান্য করা বাধ্যতামূলক ছিল। "দি লাইফ অব মুহাম্মদ" (সাঃ) গ্রন্থে মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল বলেন, ১৪০০ বছর আগে মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক রচিত রাজনৈতিক দলিলটি ধর্মবিশ্বাস ও বাক স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্র, মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান ও অপরাধ দমনের প্রশ্নে রাজনৈতিক জীবনে এক নয়া দিগন্তের উন্মেষ ঘটিয়েছিল।

মদীনা সনদ থেকে স্পষ্ট যে, উম্মাহ্ ও ইসলামী রাষ্ট্রের সংগঠনের মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল। উম্মাহ্ ছিল কেবল ইসলামের ভিত্তিতে সামাজিক সংগঠন। আর ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের সাথে সাথে রাজনৈতিক প্রয়োজনকে বিবেচনায় রেখেছিল। উম্মাহ্ তাই কেবল মুসলিমদেরই অন্তর্ভুক্ত করেছিল। অন্যদিকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়ায় ও মুসলিমদের সঙ্গে নিরাপত্তা ও শান্তিতে থাকার শর্তে অমুসলিমরাও মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মদীনা সনদের ১ থেকে ৪৭ অনুচ্ছেদে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিষয়ে নিশ্চয়তা সৃষ্টির প্রয়াস ছিল। এ সনদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক, সরকার প্রধান,আইনের ব্যাখ্যাতা, শাসক, সেনাপতি, ধর্মপ্রচারক, সমাজ সংস্কারক এবং সমাজ কাঠামোর নিয়ন্ত্রক হিসেবে চূড়ান্ত স্বীকৃতি পান। সকল বিষয়ে আল্লাহ্র বিধানানুযায়ী ফয়সালার কর্তৃত্ব লাভ করেন তিনি। সনদের মুখবন্ধ এবং ১ ও ৪৭ অনুচ্ছেদ থেকে এর ইসলামী চরিত্র ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃত্বের বিষয় স্পষ্ট হয়।

ইসলামী রাষ্ট্র

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র আল-কুরআনের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ও যাত্রা শুরু করে। নিরাপত্তা, শান্তি, আইনের চোখে সমতা, নাগরিক সমঅধিকার, নাগরিকদের ঐক্যের বন্ধন ও রাষ্ট্রীয় সংহতি, বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, অমুসলিমদের বৈষয়িক ও অন্যান্য স্বার্থ সংরক্ষণ ইত্যাদির লিখিত স্বীকৃতি ও সার্থক বাস্তবায়নের মাধ্যমে মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র ছিল এক সুসংগঠিত ভূখন্ড ও ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টিসহ একটি দায়িত্বশীল সুদৃঢ় সরকারের অধীনে এক সার্বভৌম কর্তৃত্ব-নির্ভর আদর্শ রাষ্ট্র। গোত্র বিভাজনে জর্জরিত ও রক্তারক্তিতে বিপর্যস্ত, অনাচার-অবিচার-অনৈতিকতায় নিমজ্জমান এক আইয়ামে জাহিলিয়াত থেকে বহুধাবিভক্ত মানবগোষ্ঠীকে মুক্ত করে এক সভ্য ও সুশৃংখল আল্লাহ্ বিশ্বাসী ইসলামী জনমন্ডলীতে রূপান্তরকরণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিতরকার কেন্দ্রীয় সত্য।

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র ও আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব

আজকের যুগের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ব্যক্তিক-রাজতান্ত্রিক বহিপ্রকাশ কিংবা গণতান্ত্রিক দর্শনের জনগণের সার্বভৌমত্বের কোনো তত্ত্ব রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। মৌলিক ভিন্নতা ও পার্থক্য নির্দেশ করে মদীনার ইসলামী

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক হিসেবে আল কুরআনের শর্ত অনুযায়ী স্বীকার করা হয়েছিল স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে।

আল কুরআনের সূরা আলি ইমরানের ২৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ 'বল, হে আল্লাহ্, সকল মুল্কের মালিক। তুমি যাকে ইচ্ছা রাষ্ট্র দান কর, আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাষ্ট্র ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর, আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। সকল কল্যাণ তোমারই ইখতিয়ারধীন। তুমিই সকল কিছুর উপর সর্বক্ষমতাবান'।

সূরা আল আনআম-এর ১৮ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'তিনি তাঁর বান্দাদের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী'। সূরা আর রাদ-এর ৩১ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'বরং সমস্ত ক্ষমতা-ইখতিয়ার তো আল্লাহ্রই হাতে রয়েছে'। সূরা আল আরাফ-এর ৫৪ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'সাবধান, সৃষ্টি তাঁরই এবং সার্বভৌম ক্ষমতাও তাঁর'। সূরা আত্ তীন-এর ৮ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'আল্লাহ্ কি সব শাসনকর্তার বড় শাসনকর্তা নন?'। সূরা আল ইউসুফের ৪০ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'বস্তুতঃ সার্বভৌমত্বের কর্তৃত্ব আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই'। সূরা আশ্ শূরা-র ৪৯ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই'। সূরা বণী ইসরাঈলের ১১১ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'তাঁর সার্বভৌমত্বের কোনো অংশীদার নেই'। সূরা আল আন'আমের ৫৭ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'হুকুম তো আল্লাহ তা'আলারই'। সূরা আল কাহ্ফ-এর ২৬ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'তিনি নিজ হুকুমে কাউকে শরীক করেন না'।

আল কুরআনে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের স্পষ্টতম ঘোষণা মেনে নিয়ে মদীনায় নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মালিকও ছিলেন আল্লাহ্। অর্থাৎ আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল ছিল। আইন ও বিধানের মালিকও আল্লাহ্তা'আলা। সূরা বণী ইসরাঈলের ৬৫ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'হে নবী, আমার বান্দার উপর তোমার কোনো আধিপাত্য নেই, তোমার প্রতিপালকের আধিপত্যই যথেষ্ট'।

আল্লাহ্র প্রতিনিধি

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে কুরআনের এ ঘোষণা স্বীকার করে নিয়ে কুরআনেরই ঘোষণা অনুযায়ী 'খিলাফতুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে নবী করীম (সাঃ) মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান পদে থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা ছোয়াদ-এর ২৬ নাম্বার আয়াত, সূরা আরাফের ৬৯ এবং ৭৪ নাম্বার আয়াত, সূরা ইউনুসের ১৪ নাম্বার আয়াত, সূরা আনআমের ১৬৫ নাম্বার আয়াতসহ নানাস্থানে আল্লাহ জমীনে খলিফার মাধ্যমে শাসন পরিচালনা তথা প্রতিনিধিত্বের কথা জানিয়েছেন। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা তাই উত্তরাধিকার, বংশীয় বা পারিবারিক সম্পত্তি কিংবা জবর দখলের বিষয় নয়। এটি আসমানী আমানত এবং আল্লাহ্র খলিফা হিসেবে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ও শাসন পরিচালনার গুরু দায়িত্বের স্মারক।

সরকার প্রধান হিসেবে সাফল্য

উপরোক্ত অর্থেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এর রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান হিসেবে যাবতীয় দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন। কুরআনের তথা শরীয়ার আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ব্যবস্থা, দৈনন্দিন সরকারী প্রশাসন পরিচালনা, সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ-বদলী-পদোন্নতি-নির্দেশনা সমাধা, উৎপাদন-অর্থনীতি ও বাজার নিয়ন্ত্রণ, সুসংবদ্ধ প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন ও পরিচালনা, চুক্তি স্বাক্ষর, পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ, দূত প্রেরণ, সামাজিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষা ও সম্পর্ক উন্নয়ন, বিচার বিভাগ পরিচালনা, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, দ্বীনী দাওয়াত, জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি

যাবতীয় কার্য সমাধা করেছেন। মদীনায় নির্মিত মসজিদ-উন-নববী ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সরকারের হেড কোয়ার্টার। এখানে যেমন মুসলিমদের জামাত হতো, সালাত আদায় করা হতো, তেমনি এখান থেকে যাবতীয় সরকারী হুকুম, কর্মব্যবস্থাপনা, রাষ্ট্রীয় ফরমান জারী, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও বিদেশী রাষ্ট্র প্রধানদের পত্র প্রদান, বিদেশী দূতদের স্বাগত জানানো ইত্যাদি কাজও সমাধা করা হতো।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জীবনের ১০টি বছর মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন দক্ষতার সাথে। রাষ্ট্রে নিয়ম-কানুন ও ব্যবস্থাপনা তিনি এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে, তিনি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজে নেতৃত্ব দিতে গেছেন তখন এবং এমন কি তাঁর ইন্তেকালের পরও খুলাফা-ই-রাশিদীন তাঁর খলিফা হিসেবে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রকে যথাযথভাবে পরিচালনা করতে পেরেছিলেন।

মদীনা সংবিধান নামে পরিচিত রাসূল করীম (সাঃ)-এর 'কিতাব' অনুসারে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের আসমানী পরিচালক(ডিভাইন ডিরেক্টর) এবং সামরিক বাহিনীর প্রধান (সুপ্রীম কমান্ডার) ছিলেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও সেনাবাহিনী

তৎকালীন পরিবেশে শত্রু পরিবেষ্টিত পরিমন্ডলে মুহাম্মদ (সাঃ) মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, নিরাপত্তা ও সংহতির জন্য স্থায়ী প্রতিরক্ষা বাহিনী (স্ট্যান্ডিং আর্মি) গড়ে তুলেছিলেন। তিনি এক দশকের মধ্যেই ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক সংগঠনকে এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে, অতি উন্নত এক সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখতে পেয়েছিল বিশ্ববাসী। সময়ের প্রয়োজন ও সামরিক প্রতিরক্ষাগত রণকৌশল বিবেচনায় রেখে তিনি সামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ দিতেন। সেনাবাহিনীর কাঠামোর মধ্যে ছিল ঃ সেনানায়কবৃন্দ(উমারা আল-সারিয়া), সামরিক কর্মকর্তাগণ (উমারা আল মায়মানাহ, মায়সারাহ, মুকাদ্দামাহ ও সাকাহ্), পতাকাবাহী (সাহিব আল লিওয়া ওয়া'আর-রায়াহ), স্কাউট (তালিআহ্), গুপ্তচর (উয়ূন), পথ প্রদর্শক(দালীল) যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ ও যুদ্ধবন্দীদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আসহাবু'ল মাগানিম ওয়া'ল আসারা), যুদ্ধাস্ত ও যুদ্ধাশ্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আসহাবু'স সিলাহ ওয়া'ল ফারাস) এবং দেহরক্ষীগণ(আসহাবু'ল হারাস)।

মহানবী (সাঃ) তাঁর যুদ্ধকালে সেনা পরিচালনায় অনেক সময় "আল খামিস" পদ্ধতি অনুসরণ করে সেনাবাহিনীকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলো ছিল কাল্‌ব(কেন্দ্র), মায়মানাহ(দক্ষিণবাহু), মায়সারাহ (বামবাহু), মুকাদ্দামাহ্ (অগ্রবর্তী বাহিনী) ও সাকাহ্(পশ্চাদরক্ষী)। নবী করীম(সাঃ) তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনার জীবনে ৮০টি যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। 'গাজওয়াত' বা বড় যুদ্ধ যাতে তিনি নিজে সেনাপতি হিসেবে অংশ নিয়েছেন এমন যুদ্ধের সংখ্যা ২৭টি। এছাড়া অন্যগুলি ছিল 'সারায়া'। সেগুলিতে তিনি সাহাবী ও সেনাধ্যক্ষদের অভিযান পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়ে(আমীর আল আসকার বা সেনাপতি নিযুক্ত করে) পাঠিয়েছেন। তিনি কনভেশনাল ফ্রন্টাল ওয়ার, গেরিলা ওয়ার, সাইকোলজিক্যাল ওয়ার, সব কৌশলই প্রয়োজন মত ব্যবহার করেছেন। ট্রেঞ্চ খোঁড়া, হিট এ্যান্ড রান - সব পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন। ঈমানের বলে বলীয়ান সুশৃঙ্খল ইসলামী সেনাবাহিনীর বিন্যাস, পরিচালনা পদ্ধতি ও রণকৌশল এমন উন্নতভাবে গৃহীত হতো যে, একের পর এক বিজয় মুসলমানরা পেয়েছিলো। বদরের যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ শুরু হয়। এভাবে মক্কা থেকে হিজরতের মাত্র ৮ বছরের মধ্যেই ফতে মক্কা বা মক্কা বিজয় সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া পুরো আরব উপদ্বীপকে মুসলিম বাহিনী বিজয়ের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে মদীনাকেন্দ্রিক ইসলামী রাষ্ট্রের আওতায় আনতে সক্ষম হয়। কুফর ও তাগুতের পরাজয় এবং তৌহিদের বিজয় সূচিত হয়। নবী করীম (সাঃ) তাঁর সেনাবাহিনী দূরবর্তী অঞ্চলে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকা কালে ইসলামী রাষ্ট্র ও এর রাজধানীর

প্রতিরক্ষার জন্য 'আল হারাস' নামক নিয়মিত গ্যারিসন প্রস্তুত রাখতেন। এ ছাড়া সেনা শৃঙ্খলার জন্য ছাউনি ও শিবির অধিনায়ক, নৈশ প্রহরা, সৈন্য গণনা, প্রশিক্ষণ, জনবল বৃদ্ধি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ব্যবস্থা রেখেছিলেন। মদীনার ইসলামী সেনাবাহিনী ইনফেন্ট্রি বা পদাতিক (মুশাত) ক্যাভেলরী বা অশ্বরোহী (আল-খায়ল), তীরন্দাজ (রুমাত), বর্মধারী সৈন্য(আহলু'ল সিলাহ্) এবং সর্বশেষে সাপ্লাই কোর বা রসদবাহী (রিসসাহ) এসব ডিভিশনে বিভক্ত ছিল। কেন্দ্রীয় ছাড়া প্রদেশিক সামরিক সংক্রান্ত প্রশাসন প্রাদেশিক গভর্নরের অধীনে 'বিলায়াত' ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত করতেন নবী (সাঃ)। ইসলামী সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখায় গোত্রীয় প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতেন রাসূল (সাঃ)। ইসলামী রাষ্ট্রের অস্ত্র ভান্ডারকে ক্রমাগত যুদ্ধ নিজয়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা হয়েছিল। সেগুলোর দায়িত্বে থাকতো নির্দিষ্ট সামরিক কর্মকর্তাগণ। এছাড়া সামরিক অভিযানকালে দেহরক্ষী প্রথাও চালু করেছিলেন তিনি।

মদিনা ইসলামী রাষ্ট্রের বেসামরিক প্রশাসন

মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র নবী করীম (সাঃ)-এর আদর্শ পরিচালনায় দিন দিন প্রসার লাভ করেছিল। এ ছাড়া সুশাসন বজায় রাখার জন্যও মদীনা রাষ্ট্রের বেসামরিক প্রশাসনকে সুবিন্যস্ত করা হয়েছিল বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। মদীনা রাষ্ট্রের মূল রাষ্ট্রনায়ক ও সরকার প্রধান ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল বিভাগ, অঞ্চল ও পর্যায়ে সুশাসন পরিচালনার জন্য নবী করীম (সাঃ) স্বীয় ক্ষমতার ডেলিগেশন বা হস্তান্তর করেছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থাপনার ভিতর কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক, বিভাগীয় ও স্থানীয় প্রশাসকগণ ছিলেন। নবী করীম (সাঃ) নিজে ছিলেন এবং তাঁর প্রতিনিধিগণ (নায়িবীন)। এ ছাড়া ছিলেন উপদেষ্টা (মুশীর), সচিব (কাতিব), দূত (রুসুল), কমিশনার বা বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক (আমীল), কবি (শুয়ারা) ও বক্তা (খুতাবা) এবং আরো বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাবৃন্দ। অন্যদিকে প্রদেশিক কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নর (ওয়ালী), স্থানীয় প্রশাসকগণ (রউসা,) গোত্র গোষ্ঠী জনগণের স্থানীয় প্রতিবিধিবৃন্দ (নকীব), বিচারকগণ (কাযী), রাজার কর্মকর্তা (সাহিবুল সুক' বা আল-আন সূক। এরা নির্দিষ্ট নিয়মে সুনির্দিষ্ট শর্তে মোটামুটি স্থায়ীভাবে নিয়োজিত হতেন। এরা দায়ী থাকতেন স্বীয় উপরস্থ কর্মকর্তা ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কাছে। জনগণের কাছেও তাদেরকে জবাবদিহি করতে হতো। এরা জনগণ ও এলাকার সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের যোগসূত্র হিসেবেও কাজ করতেন। ইসলামী রাষ্ট্রে বিভিন্ন পর্যায়ে কোষাধ্যক্ষও নিয়োজিত থাকতেন। রাষ্ট্রের দৌত্যকর্ম করার জন্য সিফারাহ নামক পুরোনো প্রতিষ্ঠানটিকে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র যুগেই রিসালাহ(দূতাবাস) নামে ও ভূমিকায় পরিবর্তিত করা হয়। ইসলামের আহ্বান, সন্ধি, চুক্তি, নিরাপত্তা, সংবাদ প্রেরণ, প্রচারসহ নানা কাজ করতো দূতাবাসগুলো। ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো এবং মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের ন্যায্য অবস্থানের পক্ষে তৎপরতা চালানোই ছিল তাদের মূল দায়িত্ব।

মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রে রাসূল (সাঃ) তাঁর প্রশাসনে আরো কিছু বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছিলেন। এরা হলো ঃ আযিন (আহবানকারী), বাউয়াব (দ্বার রক্ষী) এবং হাসিব (ফটক রক্ষী)।

বিচার বিভাগ

মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রে কা'যার বা বিচার বিভাগকে অত্যন্ত উন্নতমানের করে গড়ে তোলা হয়েছিল। নবী করীম (সা:) নিজে ছিলেন প্রধান বিচারক। এ ছাড়া কুযাত বা বিচারকমন্ডলী নিয়োজিত ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বত্র। তারা তাঁদের সৎচরিত্র, ইসলামী শরীয়া এবং হুদুদ বা দন্ডবিধি সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান, উন্নত গুণাবলী, বিচার নৈপুণ্যের জন্যই বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হতেন বা থাকতেন। আল্লাহ্‌র দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট আল কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী সমাজে-রাষ্ট্রে ইনসাফ বা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য বিচারক বা বিচারালয়কে উপযুক্তরূপে গড়ে তোলা হয়েছিল।

বাজার প্রশাসন

মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রে রাসূল (সা:) বাজার প্রশাসনকে যথাযথভাবে গড়ে তুলেছিলেন। বাজারের হাল-চাল পরিদর্শন, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা, গুদামজাতকরণ ও মুনাফাখোরী নিষিদ্ধকরণ, অসাধু বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক তৎপরতা বন্ধ তরা, সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, ওজন নিশ্চিতকরণ ও ভেজাল প্রতিরোধ ইত্যাদির তদারকী ছিল বাজার প্রশাসনের কাজ। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থতৈক কাঠামোর মূল অবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্যসহ কৃষিকাজ, খেজুর ও অন্যান্য ফল-ফসল উৎপাদন, পশুচারণ ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধতা ছিল। রাজার, মেলা, আমদানী-রপ্তানী এসব চলতো নিয়মিত। রাসূল (সা:)-এর নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় সুদখোরী, গুদামজাতকরণ ও কালোবাজারী, শ্রমজীবী ও দরিদ্রদের শোষণ ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যায়। জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা সমৃদ্ধ হতে থাকে। যাকাত, সাদকাহ্ ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সাহায্যের মাধ্যমে সম্পদের পুনর্বন্টন ও সুসমবন্টন সম্পন্ন হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎসহ

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎসহ ছিল : যাকাত, সাদকাহ্ বা দান, মালে গণীমত বা যুদ্ধলব্দ নগদ অর্থ ও দ্রব্য সামগ্রী, যুদ্ধলব্দ ভূসম্পত্তি, জিযয়া কর, খারাজ বা ভূমি রাজস্ব, রাষ্ট্রীয় বূ-সম্পত্তি বা আল-ফাই (স্টট ল্যান্ডস বা ক্রাউন ল্যান্ডস)। উম্মালাউস সাদাকাত বা কর সংগ্রাহকগণ সারা দেশে নিযুক্ত থাকতেন কর আদায়ের জন্য। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সকল করা সংগ্রাহকগণই নিয়োগপত্র পেতেন। এতে তাদের নিজেদের জন্য এবং জনগণের সরকারী নির্দেশও লেখা থাকতো। এ ভাবে উভয় পক্ষই দায়িত্বশীল হতেন। সাদকাহ্ সংগ্রহের বিষয়টি লিপিবদ্ধ করার জন্য কাতিববর্গ নিযুক্ত ছিলেন। কর প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য খারাস এবং খারিস অর্থাৎ কর নির্ধারণ ও কর নির্ধারকের ব্যবস্থা ছিল। কৃষি বিষয়ক কর্মকর্তার মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের চারণভূমি(হিমা) দেখাশোনা ও পাহারার জন্য সাহিবুল হিমা (চারণভূমির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) নিয়োজিত থাকতেন। এ ছাড়া স্বচ্ছতার ভিত্তিতে বায়তুল মাল বা বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অঙ্কুর সৃজিত হয় মদীনার রাষ্ট্রে। খুলাফা-ই-রাশিদীনের সময় এটা খুবই সংঘঠিত রূপ পায়।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ও ধর্মীয় সংগঠন

আল-কুরআনের নাযিলকৃত প্রথম আয়াতই হচ্ছে সূরা আল আলাকের 'ইকরা' শব্দটি। সমগ্র কুরআনে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জ্ঞানী, অনুসন্ধানী, গবেষক, ইল্ম চর্চাকরী ও আলীমকে খুবই মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। নবী করীম (সা:) অনেক হাদীসে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনকে উচ্চতর মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি সকল মুসলিম নগরীর জন্য জ্ঞানার্জন ফরজ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র শিক্ষাদানের জন্য মসজিদকে শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এ ছাড়া দ্বীন ইসলাম প্রচার বা দাওয়াতের জন্য মুবাল্লিগ (প্রচারক) এবং মুকরী বা মুয়াল্লিম (শিক্ষক) নিয়োগ করে চারদিকে পাঠানো হতো। জ্ঞান বিতরণ ও ইসলামের শিক্ষা বিতরণের জন্য মুবাল্লিগ বা মুয়াল্লিমরা কাজ করতেন। নওমুসলিমদের শিক্ষারও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। দুরাঞ্চল থেকে আসতে না পারার কারণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে স্থানীয়ভাবে দ্বীনী শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মুফতি ও ফতোয়া

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য, রাষ্ট্র পরিচালনায় ও দ্বীন জারী রাখার প্রয়োজনে ইসলামী জ্ঞান ও বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা, রায়, পরামর্শ দেয়ার উদ্দেশ্যে মুফতিগণ বা ইসলামী আইনবেত্থা ও ফতোয়া প্রদানকারীগণকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা:)। এ ছাড়া মদীনায় রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত বহু সংখ্যাক মসজিদে সালাতে ইমামতি করার জন্য, জামাত পরিচালানার জন্য, খুতবার জন্য ইমামগণ নিযুক্ত হতেন। আযান ও ইকামমের জন্য থাকতেন মুয়াযযিনগণ। মুসলিম বর্ষপঞ্জীর শেষ মাসে ইসলামের চতুর্থ রোকন বা স্তম্ভ তথা হজ্জ পরিচালনার জন্য হজ্জবিষয়ক সংগঠনা গড়ে

তোলা হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা:) আমীরুল হজ্জ নামক কর্মকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। কুরবানী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্যও আরেকজন কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন।

মূল্যায়ন

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, নবী করীম (সা:) তাঁর জীবনকালে মদীনায় সর্ব অর্থে একটি সমৃদ্ধ ইসলামী আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে তিনি ছিলেন সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান, সেনা প্রধান, প্রধান বিচারক ও প্রধান দ্বীন প্রচারক ও শিক্ষক। এ রাষ্ট্রে কুরআন বিঘোষিত নীতি অনুযায়ী সালাত কায়েম, যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি পরিচালনা, ন্যায়ের (মারুফ) প্রতিষ্ঠা আর অন্যায়ের (মুনকার) প্রতিরোধসহ জনগণের ইহকাল ও পরকারের কল্যাণার্থে, নিরাপত্তা-শান্তি-স্বস্তি-সুখের জন্য এক ন্যায়যুগ শরায়ী আইনী ও সরকারী কাঠামোকে দৃঢ় ভিত্তি দান করা হয়েছিল। ফলে খুনোখুনি, দাস ব্যবস্থা, লুটতরাজ, হানাহানি, জ্বিনা বা ব্যভিচার, মদ্যপান, সুদ, ঘুষ, জুয়া, মুর্তিপূজা, নারীর অবমাননা, শিশু হত্যা, বয়স্কের লাঞ্চনা, এতিমের দূরবস্থা, দরিদ্রের বঞ্চনা, বংশ কৌলিন্যের বড়াই ইত্যাদি যাবতীয় অনাচারের অপনোদন ও অপসারণ হয়। রাসূল করীম (সা:) কেবল ইসলাম প্রচারই করেন নি।

তিনি খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে মদীনায় কুরআন ভিত্তিক ইতিহাসের প্রথম পূর্নাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন। এখানে রাজানীতি ও ধর্ম তথা প্রকৃষ্ট অর্থে দ্বীন একসঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত ছিল। এটি কোন অবস্থাতেই ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল না। রাষ্ট্রশাসন আর মসজিদ একসঙ্গে যুক্ত ছিল, যেহেতু ইসলাম আদ দ্বীন। এটি কমপ্লিট কোড অবলাইফ বা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এটি মুকাম্মাল নিযাম-ই-হায়াত। লক্ষণীয় যে, খ্রিস্টানদের মতো যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন বা মৃত্যুদিনের সঙ্গে সম্পর্ক রোখে বি সি/এ ডি-এর মতো 'ক্রিশ্চিয়ান এরা' তৈরির মতো গ্রহণ করা হয় নি ইসলামের হিজরী সন যখন মদীনায় হিযরত করে রাসূলুল্লাহ (সা:) দ্বীনী রাজনীতিক চেতনায় আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বভিত্তিক মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা একই ঐতিহাসিক মূহুর্তের স্বাক্ষ্যবাহী। মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র দ্বীন ও নৈতিকতার অবিচ্ছেদ্য সম্মিলনের অনুপম বহি:প্রকাশ। এর ফলে মদীনায় আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে প্রকৃষ্টতম *মনোথিইজম* বা তৌহিদী দ্বীন কায়েম হয়েছিল, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, দ্বীনের বিজয় নিশ্চত হয়েছিল, ইনসাফ কায়েম হয়েছিল।

আর. এ. নিকোলসন তাঁর "এ লিটারারী অব দি এ্যারাবস" গ্রন্থে মদিনায় রাসূল করীম (সা:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকেই মুসলিম রাষ্ট্রের সূচনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এইচ এ আর গীব এবং এরিখ উলপেবের ভাষায়, মুহাম্মদ (সা:)-এর নামের সঙ্গে বিজড়িত ধর্মীয় বিপ্লবই একটি রাষ্ট্র কাঠ্যামোর সূচনা সম্ভব করে। ভন শিগেলের মতে, মুসলিম শরীয়াই শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংবিধান নির্মাণ করেছে। ভন ক্রেমারের মূল্যায়ন হচ্ছে, মুহাম্মদ (সা:) কেবল নতুন ধর্মই প্রিতিষ্ঠিত করেন নি, বরং রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আদিল সালাহি তাঁর "মুহাম্মদ ম্যান এ্যান্ড দি প্রফেট" গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন নবী করীম (সা:)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসাটাই ইতিহাসের প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্টার দিগন্ত উম্মোচন করে।

সারকথা

হযরত মুহাম্মদ (সা:) তাঁর কর্তৃক প্রণীত মদিনা সনদ-এর ভিত্তিতে মদিনায় একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যাদিষ্ট আল কুরআন অনুযায়ী এই রাষ্ট্র গঠিত, বিকশিত ও পরিচালিত হয়। মদীনা সনদের মাধ্যমে ইসলামী উম্মাহ গড়ে উঠে। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ছিল মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্‌র আইনই ছিল এ রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি। হযরত মূহাম্মদ (সা:) খিলাফাতুল্লাহ বা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসবে দশ বছর ধরে এই রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন এই রাষ্ট্রের এবং এর সরকারের প্রধান। এই রাষ্ট্রে স্থায়ী সেনাবাহিনী, সুনির্দিষ্ঠ বেসামরিক প্রশাসন, বিচার বিভাগ, খামার প্রশাসন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শিক্ষা ও ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক সম্পর্কসহ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন ও কার্যকর করা হয়েছিল। রাষ্ট্র, রাজনীতি, সমাজের সঙ্গে দ্বীন ইসলামের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের ভিত্তিতে, ইসলামী শরীয়া মোতাবেক এই ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হত। রসুল (সা:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনার প্রথম পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রছিল আল কুরআন ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্রের চিরায়ত মডেল। খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে শুরু করে ইবনে সীনা, ইবনে রুশ্‌দ, আল কিন্দি, আল গাজ্জালী (রা:) ইমাম আবু হানিফা (রা:) সহ পরবর্তীকালের সকল ইসলামী চিন্তাবদি ও গবেষক রাসূল্লাহ (সা:) এর মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং সেটাকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। কোন শতকে মদিনায় পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র কায়েম হয়েছিল?

ক) নবম শতকে;

খ) সপ্তম শতকে;

গ) ষষ্ঠ শতকে;

ঘ) অষ্টম শতকে।

২। হযরত মুহাম্মদ (সা:) মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন -

ক) ১০ বছর;

খ) ১৫ বছর;

গ) ১২ বছর;

ঘ) ৯ বছর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। মদীনা সনদ কি?

২। ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

৩। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব বলতে কি বুঝেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচলনার ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর ভূমিকা আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তরমালা

১। খ, ২। ক

পাঠ-১

খোলাফায়ে রাশেদীন (৬৩২-৬৬১ খ্রি:)

উদ্দেশ্যে

এ পাঠ শেষে আপনি -

- ❑ খোলাফায়ে রাশেদীন ও খিলাফতের ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ❑ ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শ বর্ণনা করতে পারবেন;
- ❑ খলিফাদের নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ❑ খলিফাদের রাষ্ট্রদর্শন আলোচনা করতে পারবেন;
- ❑ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

হযরত মুহাম্মদ (স:) এর মৃত্যুর পর যে চারজন সাহাবী তাঁর প্রতিনিধিরূপে আরব রাষ্ট্র ও মুসলিম জাঁহানের নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরাই ইতিহাসে খোলাফায়ে রাশেদীন বা সত্য ও ন্যায় পথগামী নামে পরিচিত। হযরত মুহাম্মদ (স:) এর নির্দেশিত পথে যে বিশিষ্ট চারজন সাহাবী নিজেদের জীবন ও রাষ্ট্রের কার্যাদি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত করেছেন তাঁরা হলেন-

- হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা:)
- হযরত উমর ফারুক (রা:)
- হযরত ওসমান গনি (রা:)
- হযরত আলী (রা:)

খিলাফত হচ্ছে ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।যে কোন পদ্ধতি থেকে এটি এক ভিন্নধরনের সরকার পদ্ধতি। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক ইবনে খালদুনের মতে খিলাফত হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মিশনের প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি আরও বলেন যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মৃত্যুর পরে যাঁরা তাঁর আদর্শ প্রচারণার দায়িত্ব পালন করেন তাঁদেরকে খলিফা বলা হয়। সুতরাং খলিফা হচ্ছেন মহানবীর প্রতিনিধি। তাঁরা একাধারে ছিলেন রাষ্ট্রের নেতা অন্য দিকে ইমাম। তাঁরা তিরিশ বছর কাল মুসলিম জাঁহানের খেলাফতের পদ অলংকৃত করেছিলেন।

ইসলামের সরকার পদ্ধতিকে খিলাফত বলা হয়

এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক পি,কে হিট্রি বলেন," এটি এমন একটি যুগ ছিল, যে যুগ হযরত মুহাম্মদ (স:)-এর জীবনাদর্শ, খলিফাদের চিন্তাধারা ও কর্মের উপর জ্যেতির্ময় আলোকছটার' প্রভাব বিস্তার করা থেকে বিরত হয়নি।" মজিদ খাদ্দুরীর ভাষায় খিলাফত ছিল ধর্মীয় ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পার্থিব শাসন কাঠামো।ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন হয়েছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে । তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (স:) প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মকে মজবুত করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত। তাঁদের শাসন ছিল ন্যায় ও ইনসাফে পরিপূর্ণ। হযরত মুহাম্মদ (স:) মদীনায় যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে উক্ত রাষ্ট্র পূর্ণতা লাভ করে। হযরত মুহাম্মদ (স:) এর জীবদ্দশায় বিভিন্ন কারণে নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র সুসংহতকরণ সম্ভবপর হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে রাষ্ট্রের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয়।

নির্বাচন পদ্ধতি

খিলাফত ছিল একধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। খলিফাদের নির্বাচন এক প্রকারের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংঘটিত হয়েছিল। উত্তারাধিকার সূত্রে কেউ খলিফার পদ লাভ করে নি। খলিফা নির্বাচনের দুটি পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। খলিফা সরাসরি নির্বাচিত হতেন বা নির্বাচক মন্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হতেন। খিলাফতের ইতিহাসে নির্বাচন ও মনোনয়ন উভয় পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। নির্বাচক মন্ডলীর সদস্যগণ শিক্ষিত, ন্যায়পরায়ণ ও প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন খলিফা দায়িত্বে

খিলাফত ছিল একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা

থাকাকালীন সময়ে পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য 'আহল আল ইমামাহ' বা একটি নির্বাচকমন্ডলী গঠন করতেন। গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হযরত মুহাম্মদ (স:) ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালনা এবং খলিফা নির্বাচনের দায়িত্বভার সমস্ত মুসলমানদের উপর ন্যস্ত করে গিয়েছিলেন। জনগণের রায় ব্যতীত কেউ খলিফা হতে পারতেন না।

ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শ

খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে আমরা ইসলামী রাষ্ট্রের নমুনা পাই। ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শ ছিল নিম্নরূপ:

- আল্লাহ এর সার্বভৌমত্ব। কেবল আল্লাহর আইন বৈধ হবে;
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। খলিফা ও আমীরগণ বিচার বিভাগের অধীন ছিলেন;
- ধনী-গরীব, ফকির-বাদশাহ আইনের চোখে সকল মানুষই সমান;
- রাষ্ট্রের সকল মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে;
- নাগরিকের মৌলিক অধিকার আইনের মাধ্যমে আদায় করার বিধান;
- জাতীয় সম্পদের ন্যায়সংগত বন্টন;
- বায়তুলমাল সর্বসাধারণের, খলিফা শুধু রক্ষক মাত্র;
- শাসক–শাসিতের মধ্যে সুস্পর্ক;
- পরামর্শের ভিত্তিতে শাসন কার্যাদি পরিচালনা করা এবং জনসাধারণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন।

রাষ্ট্রনীতি

রাজনীতির ক্ষেত্রে খলিফাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতো পবিত্র কোরআনের কালেমার রাজনৈতিক বিধি-বিধান ও আদর্শের দ্বারা। আইনের শাসন তাঁদের কঠোরভাবে মেনে চলতে হতো। জনস্বার্থ কিংবা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কথা বলে তাঁরা আইনের শাসন থেকে অব্যাহতি পেতেন না। ইসলামী অনুশাসনের পরিমন্ডলে জনসাধারণ রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রা:) নির্বাচিত হয়ে জনগণের কাছে বললেন, "আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও রসুলের নির্দেশ মেনে চলবো ততক্ষণ আমি আপনাদের আনুগত্যের অধিকারী। আমি ঠিক পথে চললে আপনারা আমাকে অনুসরণ করবেন। আমি ভুল করলে আপনারা আমার ভুল সংশোধন করে দিবেন।"

খলিফাল বিশ্বাস ছিল যে খিলাফতের অন্তর্গত প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব সরকারের

দ্বিতীয় খলিফা হয়রত উমর (রা:) ঘোষণা করেছিলেন, উম্মাহর সমর্থন না থাকা সত্ত্বেও যারা জোর করে ক্ষমতা দখল করে এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে তাঁদের এবং তাদের সমর্থকদের হত্যা করা উচিৎ। হযরত উমর (রা:) তাঁর খিলাফতকালে সাম্য ও স্বাধীনতার মহৎ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর ইসলামী রাষ্ট্র দরিদ্র ও বঞ্চিতদের সর্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। হযরত উমর (রা:) বলেছিলেন, যদি ফোরাত নদীর তীরে একটি কুকুরও না খেয়ে মারা যায়, বিচারের দিনে তার জন্য উমরকেই জবাবদিহি করতে হবে। খলিফাগণ রাতের অন্ধকারে খুঁজে বেড়াতেন কারা অভাব অনটনে আছে।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে উচ্চ ও নিম্ন কর্মচারীদের মধ্যে বেতনের আকাশ পাতাল তারতম্য ছিল না। ইসলামের স্বর্ণযুগে খলিফা এবং রাষ্ট্রের সর্বনিম্ন কর্মচারীদের জীবন মানের মধ্যে তেমন পার্থক্য ছিল না। সরল জীবন যাত্রা ও কৃচ্ছসাধণ ছিল তাঁদের জীবনের বৈশিষ্ট্য। জনসাধারণের অর্থে ধনী হওয়ার প্রবণতা তাঁদের ছিল না। খলিফাগণ অতি সাধারণ জীবন যাত্রার আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রনীতির একটি মৌলিক দিক হল যে, প্রশাসকদের জীবনযাত্রার মান কিছুতেই জনগণের জীবনযাত্রার মান থেকে উন্নত হবে না। জনগণ হল মনিব, আর শাসক হলো ভৃত্য। খলিফা উমর (রা:) জোতদারীর

জনগণ হল মানিব, আর শাসক হলো ভৃত্য

মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। তাঁর খিলাফতকালে সাহাবীরা জমি কিনতে পারতেন না। খলিফাগণ বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক অভাবগ্রস্থ ভ্রাতা তাদের সম্পদের এক একজন অংশীদার। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের মালিক আল্লাহ। তাঁরা প্রতিবেশীর অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন এবং প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করার ব্যবস্থা করতেন। সমাজ থেকে অত্যাচার ও অনাচার নির্মূল করে সত্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাঁদের প্রধান কাজ।

ইসলামী রাষ্ট্রদর্শন মতে রাষ্ট্র, সরকার এবং ধর্ম আলাদা নয়, বরং একই সূত্রে আবদ্ধ । ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে বলে। যে বিধান জনগণের প্রতি সুবিচার করে না ইসলাম তা সমর্থন করে না। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে হযরত মুহাম্মদ (স:) মদীনায় এক সফল রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানুষের সার্বিক কল্যাণ। উচ্ছেদ করা হয়েছিল বর্ণগত, গোত্রগত, জাতিগত ও অঞ্চলগত প্রভেদ। জনগণ দ্ব্যর্থহীনভাবে শাসন কর্তাদের সমালোচনা করতে পারতেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল। তাঁরা জনগণের ইচ্ছাকে সরকার ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কঠোর ভাবে মেনে চলতেন। উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা গ্রহণের নীতি তারা অপছন্দ করতেন। বিশ্বাস করা হতো যে, প্রতিটি নাগরিকই আইনের চোখে সমান। কেউ শরীয়তের উর্দ্ধে নয়। ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলে মনে করা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রদর্শন এক অনন্য বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান।

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালার সার্বভৌমত্ব হল কোরআন ও সুন্নাহর আইনের সার্বভৌমত্ব। আসমান, জমিন ও তার মধ্যস্থিত সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে আল্লাহতায়ালার সার্বভৌমত্ব ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। খলিফাগণের আয়ত্তাধীন ভৌগলিক সীমানার মধ্যে সার্বভৌমত্বের চূড়ান্ত ক্ষমতা কার্যকর হয়েছিল। তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আদেশ-নিষেধের রাজনৈতিক ক্ষমতা সকল বিচারলয়ের মাধ্যমে আইনসম্মত রূপদান করেছিলেন। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কাজ করলে বিধান মোতাবেক কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা:) এর পুত্রকেও এক্ষেত্রে অব্যাহতি দেওয়া হয় নি। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী আল্লাহতায়ালার সার্বভৌমত্বের মধ্যে সার্বজনীন গুণ বিদ্যমান যা পার্থিব ও পারলৌকি জীবনে এক অবিভাজ্য একত্বের সূচনা করে। ইসলাম ধর্ম মতে আরো মনে করা হয় যে, আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বই কার্যকরভাবে ও দক্ষতার সাথে মানুষের অহমিকা ও ক্ষমতা লিপ্সাকে প্রতিহত করতে পারে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ অপসারিত করতে পারে। আল্লাহর অবিভাজ্য, সার্বজনীন সাবভৌমত্ব হযরত মুহাম্মদ (স:) ও তাঁর খলিফাগণ স্বার্থকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁরা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি আত্মসমর্থন করেছিলেন। খলিফা আল্লাহর আইনের বরখেলাপ করলে বিচারক তাঁকে পদচ্যুত, এমনকি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত দিতে পারতেন।

আল্লাহর আইন মানুষের স্বাধীনতা, অধিকার ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ করে। কারণ ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থে বা ইচ্ছায় কুরআন সুন্নাহর আইন রদ করার ক্ষমতা কারো নেই। ইসলামী মতে আরোও মনে করা হয় যে, জনগণের সার্বভৌমত্বে প্রচলিত মতবাদ ও নীতিতে বিরোধ ও সংঘর্ষ চলতে থাকে। অ-ইসলামিক রাষ্ট্রে শাসকশ্রেণী দল মত সকলের জন্য নয় বরং শ্রেণীর স্বার্থে আইন করে। নাগরিকদের মধ্যে সকলের সমান অধিকার না থাকার

ফলে তাদের মধ্যে ভয়ভীতি, নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি অশান্তি বিরাজ করে। বিশেষ গোত্র বা দলের জন্য বিশেষ সুবিধা মানুষের স্বাধীনতা ও ন্যায়সংগত অধিকারে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। মনে করা হয়, আল্লাহর এই সার্বভৌম চরম, সীমাহীন, স্থায়ী ও ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন। এটিকে অন্যকোন আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ বা বিভক্ত করা যায় না। সর্বশক্তিমান আল্লাহই হচ্ছেন একমাত্র আদেশ ও নিষেধ দাতা। খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান এই সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামোকে সুসংহত ও সুসংগঠিত করবেন।

সারকথা:

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগকে ইসলামের স্বর্ণযুগ বলা হয়।ইসলামে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলামী আদর্শে মনে করা হয় যে, ইসলাম হচ্ছে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিপূর্ণ জীবন বিধান। হযরত মুহাম্মদ (স:) ইসলামের মজবুত ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের চারজন খলিফা সবাই তাঁদের জীবনকে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। ইসলামী মতে উৎকৃষ্টতর সরকার পদ্ধতি হচ্ছে-ঃ
(ক) সমাজতন্ত্র; (খ) গণতন্ত্র;
(গ) খিলাফত; (ঘ) কম্যুনিজম।

২। হযরত মুহাম্মদ (স:) ইসলামী রাষ্ট্র কোথায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন?
(ক) মক্কায়; (খ) মদীনায়;
(গ) আরবে; (ঘ) হিজাজে।

৩। খিলাফত ছিল-
(ক) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা; (খ) একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা;
(গ) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা; (ঘ) ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

৪। জোতদারীর মূলে কে কুঠারঘাত করেছিলেন?
(ক) হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা:); (খ) হযরত উমর (রা:);
(গ) হযরত ওসমান (রা:); (ঘ) হযরত আলী (রা:)।

৫। খলিফাগণ সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন -
(ক) জনগণের সার্বভৌমত্বে; (খ) মানুষের আইনে;
(গ) সুন্নাহর প্রতি; (ঘ) আল্লাহর সার্বভৌমত্বে।

উত্তর মালা- ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। খ ৫। ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। খিলাফত বলতে কি বুঝায়?
২। খিলাফতের নির্বাচন পদ্ধতি কেমন ছিল ?
৩। ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শগুলো কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৩

মোহাম্মদ আল ফারাবী (৮৭০-৯৫০ খ্রি:)

উদ্দেশ্য
এ পাঠ শেষে আপনি -
❑ আল ফারাবীর পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবেন;
❑ আল ফরাবীর রাষ্ট্রদর্শন আলোচনা করতে পারবেন।

মোহাম্মদ আল ফারাবীর আসল নাম হচ্ছে আবুনসর ইবনে মোহাম্মদ আল ফারাবী। আল ফারাবী ৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কি সভ্যতার পীঠস্থান ফারাব শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে তুর্কি ছিলেন। এ জন্য ফারাবী আল তুর্কি উপাধি ব্যবহার করতেন। তাঁর সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তিনি ফারাবেই তাঁর বাল্যজীবন ও শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন। অত:পর তিনি বুখারায় কাজীর পদে নিযুক্ত হন। ঘটনা বৈচিত্রে তাঁর জীবন ছিল পরিপূর্ণ। তিনি জ্ঞান অর্জনের অদম্য বাসনা নিয়ে বাগদাদ শহরে গমন করেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি বাগদাদে তিনি ৪০ বছর অতিবাহিত করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি আরবী ও গ্রীকভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে অনেক দেশ ভ্রমন করেন।

আল ফারাবী দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সঙ্গীত, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের উপর শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি সর্বপ্রথম ইসলামী তর্কশাস্ত্র ও ইসলামী বিশ্বকোষ রচনা করেন। তিনি ইসলামী দর্শনের জনকস্বরূপ ছিলেন। রাষ্ট্রতত্ত্বের উপর তাঁর নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলো খুবই উল্লেখযোগ্য যথাঃ *আলমদিনাতুল ফাজিলাহ* বা *আদর্শ রাষ্ট্র*, *আলমদিনাতুল মাদানিয়া* বা *নগর রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা*, *জওয়ামিনুস সিয়াসাত*, *ইজতিমাউ মাদানিয়া*, *খাওয়ামি নিয়ামত।*

উল্লেখ্য গ্রন্থগুলো ছাড়াও ফারাবী এরিস্টটলের দর্শন উত্তম রূপে পাঠ করেন এবং এরিস্টটলের পলিটিকস্ ও লজিকের উপর বিশ্লেষণ মূলক পুস্তক রচনা করেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি বিচরণ করলেও মূলত: গ্রীকদর্শন সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানই তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। তিনি *সিয়াসত* ও *আরা* গ্রন্থে রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেছেন। ফারাবী শেষ জীবনে সিরিয়ার আলেপ্পাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং জ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন হন। তিনি প্রাচ্যের দ্বিতীয় মহাগুরু হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রাষ্ট্রদর্শন

আল ফারাবী গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর *'দি রিপাবলিক'* ও *'দি লজ'* গ্রন্থের উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রতত্ত্ব বিষয়ক চিন্তা ভাবনা শুরু করলেও নিজের ব্যক্তিগত বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোকে রাষ্ট্রের নতুন ব্যাখ্যা দান করেন। তাঁর আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই প্লেটোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর। আল ফারাবীর মতে, মানুষ তার সুখ, শান্তি, আরাম, আয়েশ ও সমৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের সমবায় গঠন করে থাকে। গ্রাম-শহর, জনপদ, রাষ্ট্র, জাতি সবই সমবায় ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। রাষ্ট্র এ সমবায় ব্যবস্থারই পূর্ণাঙ্গ রূপ। তিনি এরিস্টটলের সুরে বলেন যে, রাষ্ট্র হচ্ছে সকল সমবায়ের শ্রেষ্ঠতর সংগঠন। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে আল ফারাবীর মতবাদে সপ্তদশ ও আষ্টদশ শতাব্দীর হব্‌স্, লক ও রুশোর মত সামাজিক চুক্তিবাদীদের মতবাদের সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুইই বিদ্যমান। তিনি এ সব চুক্তিবাদীদের কাল্পনিক প্রকৃতির রাজ্যে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আগে থেকেই ছিল, কিন্তু এই রাষ্ট্রে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার ছিল না। আদিকালে মানুষে মানুষে দ্বন্দকলহ ও সংঘাত লেগেই থাকত। দুর্বলেরা মার খেত সবলের হাতে। এই

মূলত: ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানুষ পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হয়।

নাজুক অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তির শর্তানুযায়ী সিদ্ধান্ত হয় যে, কেউ কারো উপর অত্যাচার ও জুলুম করবে না, এবং বল পূর্বক কারো সম্পদ ছিনিয়ে নিবে না। কেউ চুক্তি ভঙ্গ করলে সকলে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের অধিকার রক্ষা করবে। তাঁর মতে মানুষের যুক্তিবোধের উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল ফারাবীর এই মতবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক চিন্তা ধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আল ফারাবী বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বময় এক রাষ্ট্র গঠনের কথাও কল্পনা করেছেন। তবে তিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমবায়ের কথা অস্বীকার করেন নি। তিনি উল্লেখ করেন যে ইতিহাসের বিবর্তন ধারায় সমবায় ব্যবস্থা সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রযোজ্য হবে। কালক্রমে জাতি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে সাম্রাজ্য গঠন করবে। সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ সম্পর্কে আল ফারাবীর বক্তব্য খুবই প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলো ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের লোভে দূর্বল জাতিগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। এ পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। এই অনাকাঙ্খিত জটিল সমস্যার মোকাবিলায় তিনি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে জোটবদ্ধ হয়ে শক্তি সঞ্চয়ের কথা বলেছেন। তাঁর এই বক্তব্য বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মানুষের যুক্তিবোধের উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আদর্শ রাষ্ট্রের শাসক

ফারাবী আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্লেটোর *'দি রিপাবলিক'* গ্রন্থে বর্ণিত আদর্শমন্ডিত দার্শনিক শাসকের কথা কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রনায়ক হবেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত অন্য কারও আদেশ তিনি পালন করবেন না। মানব দেহে আত্মার স্থান যেমন সর্বোচ্চ তেমনি রাষ্ট্রে ও সমাজে রাষ্ট্র নায়কের স্থান সর্বোচ্চ। প্লেটোর মত ফারাবীও জোরালো কণ্ঠে বলেন কেবল দার্শনিকদেরই শাসক হওয়া উচিৎ। কারণ তাঁরাই সমস্ত সৎগুণের অধিকারী। ফারাবী সার্বভৌমকে 'রাইসুল আউয়াল' বা প্রধানতম নেতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি অন্য কোন শক্তির অধীনে থাকবেন না। তাঁর আদেশ অন্য সকলের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে পালনীয় হবে। তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রনায়ক সততার সাথে কাজ করবেন এবং ন্যায়নীতি অনুসরণ করবেন। তিনি স্বেচ্ছাচারকে ঘৃণা করবেন। শাসক উদার চিত্তের অধিকারী হবেন এবং ক্ষমতার প্রতি লোভ থাকবেন না। ইংরেজ আইনবিদ জন অষ্টিন সার্বভৌমের যে ব্যাখা প্রদান করেছেন আল ফারাবী কয়েক শতাব্দী পূর্বেই তার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

রাষ্ট্রের ভাল-মন্দ, রাষ্ট্রের শাসন কর্তার কাজের উপর নির্ভর করে

সারকথা:

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আল ফারাবী যৌক্তিক রাষ্ট্রতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। নি:সন্দেহে বলা যায় তিনি ছিলেন প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর ন্যায় ফারাবী রাষ্ট্রনায়কের সুন্দর চিত্র অংকন করেছেন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টটলকে প্রায় বিলুপ্ত অবস্থা থেকে তিনি তুলে এনেছিলেন। তাঁর এ অবদানের মূল্য অপরীসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। আল ফারাবী বিভিন্ন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন কোথায়?
(ক) কর্ডোভায়; (খ) সিরিয়ায়;
(গ) আলেপ্পায়; (ঘ) বাগদাদে।

২। ফারাবীর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা কত?
(ক) দেড়শত; (খ) দুইশত;
(গ) শতাধিক; (ঘ) পঞ্চাশ।

৩। ফারাবী বিশ্বাস করতেন না -
(ক) কাল্পনিক প্রকৃতির রাজ্যে; (খ) ধনতন্ত্রে;
(গ) সমাজতন্ত্রে; (ঘ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে।

৪। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মোকাবিলায় ফারাবী ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তি অর্জন করতে বলেছেন কাদেরকে?
(ক) গরীব দেশগুলোকে; (খ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে;
(গ) ধনী দেশগুলোকে; (ঘ) সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে।

৫। একটি রাষ্ট্রের ভাল মন্দ কার উপর নির্ভর করে?
(ক) শাসনকর্তার উপর; (খ) আইন পরিষদের উপর;
(গ) বিচার পতির উপর; (ঘ) সামরিক বাহিনীর উপর।

উত্তরমালা ১। ঘ ২। গ ৩। ক ৪। খ ৫। ক

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। ফারাবী সার্বভৌম ক্ষমতাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?
২। রাষ্ট্রতত্ত্বের উপর লিখিত আল ফারাবীর গ্রন্থগুলোর নাম কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। আল ফারাবীর রাষ্ট্রদর্শন আলোচনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থ

১। ডঃ এম, হুদা, মুসলিম দর্শনের মূলতত্ত্ব, ঢাকা ১৯৮৮
২। মুহাম্মদ আয়েসউদ্দিন, রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি, ঢাকা ১৯৯৮।

পাঠ - ৪

ইব্ন রুশ্দ (১১২৬-১১৯৮ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইব্ন রুশ্দের দর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- গ্রীক দর্শনের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইব্ন রুশ্দ কীভাবে এটাকে আধুনিককালের জন্য সংরক্ষণ করেছেন এবং রেনেসাঁস-এর পটভূমি তৈরিতে সাহায্য করেছেন, তা জানতে পারবেন।

ভূমিকা ঃ ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন

ইব্ন রুশ্দ-এর পুরো নাম আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন রুশ্দ। তিনি ''আরাস্তু'' (এ্যারিস্টটল) এর ভাষ্যকার। মধ্যযুগের পাশ্চাত্য জগতে Averroes (আভারুজ) নামে পরিচিত। ইব্ন রুশ্দ ছিলেন কুরআন সম্পর্কিত নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম প্রকৃতিবিজ্ঞানী। তিনি একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী, পদার্থবিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ, ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক। ইব্ন রুশ্দ কর্ডোভাতে জন্মগ্রহণ করেন ৫২০ হিজরী সনে এবং ১১২৬ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ৫৯৫ হিজরী সনে এবং ১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দে।

স্পেনের এক নামকরা পরিবারে ইব্ন রুশ্দের জন্ম। তাঁর পিতামহ ছিলেন বিখ্যাত মালিকী ফকীহ আইনবিশারদ। কর্ডোভার দুনিয়াখ্যাত প্রধান মসজিদেরও ইমাম ছিলেন তিনি। ইব্ন রুশ্দের পিতাও একজন ফকীহ্ এবং কাজী ছিলেন। আল মুরাবীদ ও আল মোহাদ সুলতানদের রাজত্বকালে ইব্ন রুশ্দের দাদা ও বাবা যথাক্রমে ইমাম ও কাজীর পদে আসীন হন। এ ভাবে সরকারী প্রশাসনের সঙ্গে তাদের উভয়ের একটা সক্রিয় যোগাযোগ ছিল। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইব্ন রুশ্দ কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র ইত্যাদিতে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।

প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের পূর্ণাঙ্গ রচনার ভাষ্য

আল মোহাদ খলিফা আবু ইয়াকুব ইউসুফ এবং তার সন্তান আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মনসুরের আমলে ইব্ন রুশ্দ রাজ পরিবারের চিকিৎসকরূপে নিয়োজিত থাকেন। আল মোহাদ খলিফাগণ শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হওয়ায় ইব্ন রুশ্দের চিকিৎসাজ্ঞান, ফিকাহ ও দর্শনে তার পারদর্শিতা খলিফাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুলতান ইয়াকুব ইউসুফের নির্দেশে ইব্ন রুশ্দ প্লেটোর ''রিপাবলিক'' ও এ্যারিস্টটলের ''নিকোমেকিয়ান এথিকস'' এর পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য রচনা করেন। ইব্ন রুশ্দ ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সেভিলের এবং ১১৭১ খ্রীস্টাব্দে কর্ডোভার কাজীর পদ লাভ করেন। তিনি স্পেনের আন্দালুসিয়ার কাযী-উল-কুযযাতের পদে নিযুক্ত হন ১১৮২ খ্রীষ্টাব্দে।

রুশ্দের রচনাবলী

ইব্ন রুশ্দের রচনাবলীর কালানুক্রমিক হিসাব তৈরী করেছেন এম. আলোনসো। তিনি মোট কত সংখ্যক গ্রন্থ লিখেছেন তা খুব নিশ্চিতভাবে বোঝার উপায় নেই। প্রফেসর ই. রেনাঁ এবং প্রফেসর জর্জ সারটন জানিয়েছেন যে, ইব্ন রুশ্দের গ্রন্থের সংখ্যা ৬৭। প্রফেসর ব্রকেলম্যান ৩৯টি এবং ইব্ন আবী উসায়বিয়া ৪৭টি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। রেনাঁ ও সারটনের মতে ইব্ন রুশ্দের গ্রন্থের মধ্যে দর্শন গ্রন্থ ২৮টি,

চিকিৎসাবিজ্ঞান ২০টি, আইন ও ফিকাহ গ্রন্থ ৮টি, ধর্মবিষয়ক ৫টি, জ্যোতির্বিজ্ঞান ৪টি, ব্যাকরণ ২টি, পদার্থবিদ্যা ২টি এবং প্রাণীবিদ্যা সম্পর্কেও বই রয়েছে।

ইব্ন রুশ্দের গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্লেটোর ''রিপাবলিক'' ও এ্যারিস্টটলের ''নিকোমেকিয়ান এথিকস''-এর ভাষ্য, ''কিতাবুল ফালসুফা'', ''ফাসল আল মাকাল'' ''কিতাবুল মুকাদ্দিমা ফিল ফিকাহ'' এবং ''কিতাবুল কুল্লিয়াত ফিত-তিব্ব'' অন্যতম। চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে ইব্ন রুশ্দ যে ২০টি গ্রন্থ রচনা করেন, তার মধ্যে ''কিতাবুল কুল্লিয়াত ফিত-তিব্ব'' অন্যতম। যদিও এটা ইব্ন সীনার ''কানুন'' অপেক্ষা নিম্প্রভ, তথাপি ১১৬২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে লিখিত ৭ খন্ডের এই গ্রন্থে নিম্নোক্ত বিষয়ের বিশদ সমাবেশ ঘটেছে। (১) শরীরবিদ্যা (এনাটমি), (২) শরীরবৃত্ত (ফিজিওলজি), (৩) সাধারণ রোগবিদ্যা (জেনারেল প্যাথলজি), (৪) নিদান রোগ নির্ণয় (ডায়াগনসিস), (৫) ভেষজ বিজ্ঞান (মেটিরিয়া মেডিকা), (৬) স্বাস্থ্যবিদ্যা (হাইজিন) এবং ভৈষজ (থেরাপেটিকস)।

ইব্ন রুশ্দ-এর চিন্তার বৈচিত্র্য

ইব্ন রুশ্দ আল ফারাবীর যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক মতবাদে আগ্রহী ছিলেন। প্লেটোর ''রিপাবলিক'' গ্রন্থের ভাষ্য রচনাকালে ফারাবীর নৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তবে রুশ্দ প্রধানত: ইব্ন বাজ্জার চিন্তাধারার অনুসারী ছিলেন এবং তাঁর রিসালাতে প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলনের বিষয়ে এবং একাকীত্বের শাসন (রিজিম অব সলিডারিটি) সম্বন্ধে তাঁর রচিত গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেছিলেন।

ইব্ন রুশ্দ কুরআনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। আল্লাহ্র অস্তিত্ব, হুকুম, গুণাবলী, কার্যাবলী, বিশ্বসৃষ্টি, নবী প্রেরণ, তক্দীর, সুবিচার-অবিচার, ভবিষ্যৎ জীবন, আখিরাত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সুফীবাদের বিরোধিতা করা, সৃষ্টি অনন্ত বলে ধারণা দেয়া, আল্লাহকে বিশ্বজগতের অংশ মনে করা ইত্যাদিসহ ইসলামী ধারণা বিষয়ে নানাবিধ বিতর্কিত মত দেয়ায় ইব্ন রুশ্দ সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বে সেকালে এবং পরবর্তীতেও নানা ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে। গ্রীসীয় প্লেটো-এ্যারিস্টটলীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হবার কারণে ইব্ন রুশ্দের চিন্তায় ইসলামী ব্যাখ্যা ও মানবিক সীমাবদ্ধতার দর্শনের মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে বেশ কিছু ভ্রান্তি ও জটিলতা তৈরি হয়। এ ছাড়া রুশ্দের মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদের ব্যাখ্যাকে মহিমা দিতে পাশ্চাত্যেও তাকে ইসলাম বিরুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ দার্শনিক বানিয়ে ফেলা হয়। ফলে একদিকে মুসলিম বিশ্বে আলীমদের দ্বারা তাঁর সমালোচনা হয় তীব্রভাবে, অন্যদিকে গোঁড়া খ্রীষ্টানরাও তাঁকে বিভ্রান্ত বলে ঘোষণা দেন।

এ ভাবে ইব্ন রুশ্দের নামে 'সত্যের দ্বৈত তত্ত্ব' অর্থ্যাৎ 'প্রত্যাদেশের সত্য' এবং 'দর্শনের সত্য' - এমন ধারণা প্রচলিত হয়ে যায়। ইব্ন রুশ্দ গ্রীক দর্শনের প্রভাবে এর সঙ্গে ইসলামের ধারণাকে সমন্বয় করতে যাওয়াতেই ভ্রান্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে দ্বৈত সত্যের ধারণা তৈরি হয়। মুসলিম আলীমগণ ইব্ন রুশ্দকে ভুল বুঝেছিলেন খুব সম্ভবত: তাঁর আল গাজ্জালীর বিরোধিতা করায় এবং তাঁর দার্শনিক যুক্তির সঙ্গে শরীয়ার বিরোধ রয়েছে মনে করে। ওদিকে গোঁড়া খ্রীষ্টান যাজকরা তাঁকে ধর্মীয় ব্যাখ্যা থেকে নয়, বরং সাম্প্রদায়িক ধর্মবিদ্বেষ থেকেই বিকৃতভাবে তুলে ধরেছিলেন। সে সময় প্যারিসের চার্চ ইব্ন রুশ্দের প্রচারিত সূত্রসমূহ থেকে ২১৯টি সূত্রকে ধর্মবিরুদ্ধ প্রতিপন্ন করে বাতিল বলে ঘোষণা দেয়। এতদসত্ত্বেও এ্যারিস্টটলের দর্শনের উপর ইব্ন রুশ্দের ভাষ্যসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে বাধ্যতামূলকভাবে থেকে যায়। 'এভেরোয়িজম' ইতালীর উত্তরাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শক্ত ভিত্তি গেড়ে বসে। এ ছাড়া পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় ইব্ন রুশ্দের ব্যাখ্যাসম্বলিত এরিস্টটলীয় দর্শন জ্ঞানার্জনের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ভ্রান্ত ধারণার নিরসন

পরবর্তীকালে অবশ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জগতে বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের ধারণা পাল্টে ফেলেন। ইব্ন রুশ্দ সম্পর্কে দ্বৈত সত্যের ধারণা পরিত্যক্ত হয়। বিশেষজ্ঞরা এই স্বীকৃতি সর্বত্রই দেন যে, ইব্ন রুশ্দ আসলে এক আর অভিন্ন সত্যের ধারণাই তুলে ধরেছেন। এটাকে 'শরীয়ার সত্য' বলা যায়। আল গাজ্জালীর বিরোধিতা করতে গিয়ে 'তাহাফুত আল তাহাফুত'' গ্রন্থে ইব্ন রুশ্দ আল্লাহ্ প্রেরিত 'ওয়াহি' বা প্রত্যাদেশ এবং রিসালতকে অস্বীকার করেন নি। আবার এ দু'টিকে তিনি 'দর্শনের সত্য' -এর কাতারেও নামিয়ে আনেন নি। উল্টো ইব্ন রুশ্দের বক্তব্য হচ্ছে শরীয়ার বিধানই আদর্শ রাষ্ট্রের সংবিধানের জন্য সর্বমৌলিক ও চূড়ান্ত। গাজ্জালীর সঙ্গে রুশ্দ আলাদা হচ্ছেন এখানেই যে, গাজ্জালী দর্শনের ভিতর শরীয়ার বিধানের অস্বীকৃতি আর বিরোধিতার সন্ধান পান। ওদিকে রুশ্দ দর্শনে শরীয়ার জন্য প্রশ্নহীন সমর্থন লক্ষ্য করেন।

ইব্ন রুশ্দ এ ভাবে মুসলিম বিশ্বে তাঁর পূর্বসুরী চিন্তাবিদ ইব্ন সীনার এবং ইউরোপে তাঁর উত্তরসুরী সেইন্ট থমাস এ্যাকুইনাসের সঙ্গে স্বীয় চিন্তার সঙ্গতি বিধান করেন। ওই দু'জনের মতো তিনিও ধর্ম বিশ্বাস ও দর্শনের সমন্বয় সাধনের পথে এগোন। ইব্ন রুশ্দ বস্তুত: দর্শনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে গ্রীক কাঠামোর উপর ইসলামী প্রত্যাদেশের মুকুট পরিধান করান। ডবি- উ. মন্টোগোমারী ওয়াট ''ইসলামিক সার্ভে''-তে এজন্যেই মত দেন যে, ইব্ন রুশ্দের জীবন ও চিন্তার গভীরে এই একই ধারণা পরিব্যাপ্ত ছিল যে, দর্শন ও প্রত্যাদেশ উভয়ই সত্য।

যাহোক, আলীমদের বিরূপ সমালোচনার মুখে খলীফা আল মনসুর ইব্ন রুশ্দকে নির্বাসন দিলেও পরবর্তীকালে আবার তাঁকে রাজ দরবারে ফিরিয়ে এনে কাজীর পদে অধিষ্ঠিত করেন।

প্রত্যাদিষ্ট শরীয়া আইনের প্রাধান্য

ইব্ন রুশ্দের চিন্তা-দর্শনের একটা মূল্যায়ন করেছেন আরউইন রোজেনথাল তাঁর "পলিটিক্যাল থট ইন মিডিয়াভাল ইসলাম" গ্রন্থে। তাঁর মতে, আদর্শ প্রত্যাদিষ্ট আইনরূপে শরীয়ার প্রাধান্য এবং আদর্শ রাষ্ট্রের আদর্শ সংবিধানরূপে শরীয়ার রাজনৈতিক ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদানে আল ফারাবী অপেক্ষা কোনোক্রমেই কম সচেতন ছিলেন না ইব্ন রুশ্দ। ইব্ন রুশ্দের দ্ব্যর্থহীন সূত্র ও স্পষ্ট বক্তব্যের ভিতর দিয়ে এমন সচেতনতারই বহির্প্রকাশ ঘটেছে। এতে করে এটাও সন্দেহাতীতভাবে বোঝা গেছে যে, ইসলাম ধর্মীয় দার্শনিকরূপে তাঁর গুরুত্ব ইব্ন সীনার চেয়ে কম নয় মোটেও।

ইব্ন রুশ্দও প্রত্যাদেশ ও দর্শনের মধ্যেকার সম্পর্ক আলোচনাকালে প্রত্যাদিষ্ট আইনকে সর্বদাই বেশি মূল্য দিয়েছেন। তিনি এটি সুস্পষ্টভাবেই অবগত ছিলেন যে, ওয়াহী বা প্রত্যাদেশের উৎস হচ্ছে আল্লাহ্র অসীম ও অভ্রান্ত প্রজ্ঞা। আর অন্যদিকে সৃষ্ট মানবের অসীম ও ভ্রান্ত যুক্তিই দর্শনের উৎস। রুশ্দ এটাও বুঝতেন যে, প্রত্যাদেশ ঘটায় অখন্ড ও সামগ্রিক সত্যের প্রকাশ। বিপরীতে দর্শনের সত্য খন্ডিত ও আংশিক। রুশ্দ আরো মনে করতেন যে, 'কালামপন্থী' ধর্মতাত্ত্বিকদের বিতর্ক নয়, ডেমোনস্ট্রেটিভ আর্গুমেন্ট বা প্রতিপাদক যুক্তিই প্রত্যাদেশের সঙ্গে দর্শনের সঙ্গতি বিধানের উপায়। এটি অবশ্য অস্বীকার করার জো নেই যে, রুশ্দ সীনা, ফারাবী এদের চেয়েও গ্রীক দর্শন দ্বারা অধিক প্রভাবিত ছিলেন এবং সে কারণে ইসলাম ও গ্রীক দর্শনের সমন্বয়ের চেষ্টায় অধিক প্রয়াসীও ছিলেন।

রুশ্দ-এর রাষ্ট্রচিন্তা

প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের সঙ্গে ইসলামী আদর্শ রাষ্ট্রের সঙ্গতি বিধানের প্রশ্নটি রুশ্দের চিন্তায় এসেছিল। রাষ্ট্রদর্শনে তিনি 'কনসেপ্ট অফ প্রফেসী' বা প্রত্যাদিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী তত্ত্বকে বিবেচনায় আনেন। রুশ্দের মতে ভবিষ্যদ্বক্তা বা নবী-রাসুলদের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে পারে। কাজেই রিসালতই শরীয়া আইনের বাহক। নবী-রাসুলগণের

নেতা, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং শেষ আসমানী গ্রন্থ আল কুরআনের বাহক হওয়ায় এবং তাঁর মাধ্যমে দ্বীন ইসলামকে পূর্ণতা দেয়ায় ও আল্লাহ মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান হিসাবে ঘোষণা দেওয়ায় হযরত মুহাম্মদ (সা:) আনীত বিধান সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র গ্রহণযোগ্য শরীয়া বিধান। এর ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রই কেবল আদর্শ রাষ্ট্রের চূড়ান্ত মডেল হতে পারে। ইব্ন রুশদের চূড়ান্ত মত থেকে এটা একেবারেই স্বচ্ছ যে, গ্রীক দর্শনের মানবিক সসীমতায় গিয়ে ঢুকলেও তিনি আল ফারাবী ও ইব্ন সীনার মতোই রাসূল করীম (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র এবং খুলাফা-ই-রাশিদীন কর্তৃক অনুসৃত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই প্রকৃত আদর্শ রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করে নিয়েছেন।

প্লেটোর ''রিপাবলিক'' হচ্ছে গ্রীক দর্শন চিন্তার কাল্পনিক আদর্শ রাষ্ট্রীয় সংগঠনের ছবি। আর রাসূল করীম (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং খুলাফা-ই-রাশিদীন কর্তৃক অনুসৃত শরীয়াভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামো ইসলামী সভ্যতার আদর্শ রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক সংগঠনের প্রকৃষ্টতম বাস্তব নমুনা। রুশ্‌দ-ও একথা বুঝতেন যে, প্লেটোর পলিটিয়া বা আদর্শ রাষ্ট্র এবং ইসলামের শরীয়াভিত্তিক আদর্শ রাষ্ট্র মোটেও এক নয়। একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত প্রত্যাদেশ-নির্ভর শরীয়ার বিধানের উপর 'খিলাফত' বা ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি। বিপরীতে প্লেটোর "রিপাবলিক" 'নোমোস' বা মানবীয় বিধানের উপর নির্ভরশীল। রুশ্‌দ বুঝেছিলেন যে, মানবীয় বিধান প্রত্যাদেশের স্থানে পৌঁছাতে পারবে না কখনো। প্রত্যাদেশ মর্যাদার দিক থেকে উর্ধ্বে। তিনি এরিস্টটলের "নিকোমেকিয়ান এথিকস"-এর যে ভাষ্য রচনা করেন, সেখানে এই সত্যের বিস্তার দেখা যায়।

মূল্যায়ন

মধ্যযুগের খ্রিষ্টীয় চার্চের অচলায়তন, গীর্জা ও চার্চের দ্বন্দ্বের সীমাহীন বিভ্রান্তি ও বিড়ম্বনার মধ্যে মুসলিম চিন্তাবিদ আল কিন্দী, আল ফারাবী, ইব্ন সীনা, ইব্ন বাজ্জা - এসব পূর্বসুরীর অনুসরণ করে ইব্ন রুশ্‌দ গ্রীক দর্শনকে বিস্মৃতির অতল থেকে তুলে এনেছেন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সংরক্ষণ করেছেন। না হলে গ্রীক দর্শন হারিয়ে যেতো চিরকালের মতো। ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও রিফর্মেশনের ভিত্তিই দাঁড়াতো না। আধুনিক ইউরোপ তথা পাশ্চাত্য জগত অন্যান্য মুসলিম চিন্তাবিদদের পাশাপাশি ইব্ন রুশ্‌দের কাছেও ঋণী। কিন্তু এই ঋণ স্বীকার করলেও আধুনিক পাশ্চাত্য রুশ্‌দের চিন্তার ভ্রান্ত ও বিকৃত ব্যাখ্যা করে এটাকে "এভেরুজবাদ" আখ্যা দিয়ে সিকিউলার বা ধর্মনিরপেক্ষ বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। অথচ ইব্ন রুশ্‌দের ব্যাখ্যায় ইসলামী শরীয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রই আদর্শ রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতম মডেল এবং

এমনকি তাঁর নিজের পৃষ্ঠপোষক আল মনসুরের রাষ্ট্রকেও তিনি 'স্টেট ইন এরার' বা আদর্শবিচ্যুত রাষ্ট্র বলে ঘোষণা দিতে বাদ রাখেন নি।

সারকথা

ইব্ন রুশ্‌দ মনে করেন যে, প্লেটোর "রিপাবলিক" হচ্ছে গ্রীক দর্শন চিন্তার কাল্পনিক আদর্শ রাষ্ট্রীয় সংগঠনের ছবি। আর রাসূল করীম(সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং খুলাফা-ই-রাশিদীন কর্তৃক অনুসৃত শরীয়াভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামো ইসলামী সভ্যতার আদর্শ রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক সংগঠনের প্রকৃষ্টতম নমূনা। রুশ্‌দ একথাও বুঝতেন যে, প্লেটোর পলিটিয়া বা আদর্শ রাষ্ট্র এবং ইসলামের শরীয়াভিত্তিক আদর্শ রাষ্ট্র মোটেও এক নয়। একমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রত্যাদেশ-নির্ভর শরীয়ার বিধানের উপর 'খিলাফত' বা 'ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি। বিপরীতে প্লেটোর "রিপাবলিক" 'নোমোস' বা মানবীয় বিধানের উপর নির্ভরশীল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। ইব্নে রুশ্দ জন্ম গ্রহণ করেন -
ক) ইরানে;
খ) ইরাকে;
গ) স্পেনে;
ঘ) বুখারায়।

২। ইবন রুশ্দ বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে?
ক) কর্ড্রোভা বিশ্ববিদ্যালয়;
খ) বিশ্ববিদ্যালয়ে;
গ) বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়;
ঘ) মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। ইব্ন রুশ্দ কি দার্শনিক প্লেটো দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন?
২। খোলাফায়ে রাশেদীনকে ইবনে রুশ্দ কিভাবে চিত্রিত করেছেন?

রচণামূলক প্রশ্ন

১। ইব্ন রুশদ-এর রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর : ১। গ, ২। ক

পাঠ - ৫

ইব্ন সিনা : (৯৮০-১০৩৭ খ্রিঃ)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইব্ন সীনার চিকিৎসা ও অন্যান্য বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানের পরিচয় পাবেন;
- ইব্ন সীনার উপর গ্রীসীয় প্লেটোনিক-এরিস্টটলীয় দর্শনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইসলামী শরীয়াভিত্তিক নীতির ভিত্তিতে জীবন, সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের অনুকূলে ইব্ন সীনার চিন্তা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা ও বৈচিত্র্যময় ব্যক্তি জীবন

ইব্ন সীনার পিতা আবদুল্লাহ "মাওরাউন নাহার"-এর সামানী আমীর দ্বিতীয় নুহের সময়ে(৯৭৬-৯৯৭ খ্রি:) নিজ জন্মভূমি বাল্খ থেকে বুখারায় উচ্চপদে নিযুক্ত হয়ে আগমন করেন। এর স্বল্প কাল পরে রাজস্ব বিভাগের এক পদে নিয়োগ দিয়ে তাকে পাঠানো হয় খারামসীন-এ। এই স্থানের সন্নিকটে আফাসানা নামক গ্রামে তিনি বিয়ে করেন এবং এখানেই সফর ৩৭০, আগষ্ট ৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ ইব্ন সীনা জন্মলাভ করেন। মুসলিম জাহানের এই চিন্তাবিদের পুরো নাম আবু আলী আল হুসাইন ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন সীনা। তিনি ল্যাটিন ভাষায় আরপবহহধ এবং হিব্রু ভাষায় আবহ ঝরহধ নামে খ্যাত। সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্যে তাঁর ইবনে সীনা নামটি চালু হয়েছে।ইব্ন সীনা বহু বিদ্যায় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি চিন্তাবিদ, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, জ্যোতির্বিদ ছিলেন। মুসলিম বিশ্বের প্রতিভাধর মুসলিম বিজ্ঞানী ইব্ন সীনা "আশ শায়খুর রাঈস" বা প্রধান শায়খ নামে পরিচিত হয়ে আছেন আজো। বস্তুতঃ দুনিয়ার সব জাতি, দেশ, কালের সেরা চিন্তাবিদ ব্যক্তিদের একজন তিনি।

রচনাবলী ও জ্ঞানের প্রসারতা

ইব্ন সীনা অল্প বয়সেই লেখালেখি শুরু করলেও জুরজান, হামাদান ও ইসফাহানের শাহী দরবারেই তাঁর রচনাশক্তির বহিপ্রকাশ ঘটে। গদ্যে ও পদ্যে এবং আরবী ও ফারসীতে রচিত ইব্ন সীনার রচনাবলী বিশাল। অল্প বয়সে রচনা করলেও ইব্ন সীনার কয়েক খন্ডে প্রকাশিত "আশ্ শিফা" অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী হয়ে উঠে। এতে তিনি দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র ও অধিবিদ্যার উপর তাঁর মতামত তুলে ধরেন। এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে তিনি রচনা করেন "আন্ নাজাত"। জীবন সায়াহ্নে এসে নিজের চিন্তার সংশোধন করে তিনি "আল ইশারাত ওয়াত তান্বীহাত" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইব্ন সীনার এ সব গ্রন্থ বহু ভাষাতে প্রকাশিত হয়েছে এবং বহু সংখ্যক পন্ডিত এ সব গ্রন্থের টীকা-ভাষ্য লিখেছেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মৌলিক অবদানের স্বাক্ষর ইব্ন সীনার "আল কানুন ফিত্ তিব্ব" বা সংক্ষেপে "আল-কানুন"। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল স্থানে সাতশ বছর ধরে অর্থাৎ সতের শতক পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধ্যাপনা আল কানুনের ভিত্তিতে হতো।

পদার্থ বিদ্যা, নভোমন্ডলীয় বিদ্যা, মানবীয় বৃত্তি বিদ্যা, আইন সম্পর্কীয় বিষয়, ভাষা ও বর্ণমালা, চুক্তি, নীতিশাস্ত্র, তাল-মান-লয়সহ সঙ্গীত ইত্যাদি সকল বিষয়ে গভীর পারদর্শিতা দেখিয়েছেন ইব্ন সীনা। তাঁর "আশ্ শিফা" গ্রন্থের সঙ্গীত ও সুর লহরীর বিশদ বিশ্লেষণ আল ফারাবী অপেক্ষাও উন্নততর।

"ফী আক্সামিল উলুমিল আক্লিয়া" যার অন্য নাম তাকাসীমুল হিক্মা ওয়াল উলুম বা জ্ঞান বিজ্ঞানের শ্রেণী বিভাগ, সেখানে ইব্ন সীনা চিন্তামূলক, পদার্থ বিষয়ক ছাড়াও অত্যন্ত

গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহারিক বিজ্ঞান হিসেবে নীতি বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাজনীতিকে চিহ্নিত করেছেন। ইব্ন সীনা ফী ইসবাতিন নুবুওয়াত বা নবী প্রেরণের সত্যতা সম্বন্ধেও গভীর জ্ঞান সমৃদ্ধ আলোচনা পেশ করেছেন।

বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির সমন্বয়

মধ্যযুগের চিন্তার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে ইব্ন সীনার মাধ্যমে। ইব্ন সীনা বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তিকে সমন্বিত করেছেন। তিনি তাঁর চিন্তায় একদিকে ইসলামের ও অন্যদিকে গ্রীসীয় প্রভাবের স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রায় ক্ষেত্রেই এ্যারিস্টটলীয় মতবাদকে বহাল রাখলেও তিনি প্লেটোনীয় মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বস্তুত তিনি মুক্ত মননের অনুসন্ধিৎসু এমন এক চিন্তাবিদ ছিলেন যিনি পূর্বের ও সমসাময়িক কালের যাবতীয় দর্শন ও বিজ্ঞান চেতনাকে সামনে রেখে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার প্রেক্ষাপটে নিজস্ব চিন্তাধারার উদ্ভাবনে প্রয়াসী ছিলেন।

দার্শনিক বিবেচনা

এরিস্টটলের মতো ইব্ন সীনার সকল রচনা ন্যায়শাস্ত্র থেকে শুরু হয়েছে। ইব্রাহীম মাকদূরের মতে, ইব্ন সীনা দর্শনে এরিষ্টটল অপেক্ষাও এগিয়েছেন। দর্শনকে তিনি এক নতুন ন্যায়ের মাত্রা দিয়েছেন। ইব্ন সীনার মতে, মানতিক একটি চিন্তামূলক শিল্প। এর কাজ হচ্ছে সঠিক সীমা ও সঠিক ধারণা অবধি দার্শনিককে পৌঁছে দেয়া। কেননা জ্ঞান যে ধরনেরই হোক না কেন, সেটা হয় তাসওয়ার অর্থাৎ নিছক ধারণা হবে কিংবা তাসদীক বা সত্যতা প্রতিপাদনকারী হবে। তাসদীকের মাধ্যম হচ্ছে কিয়াস (অনুমান)। এটা সঠিক হতে পারে, নাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে শব্দসমূহের তাৎপর্য বোঝা আবশ্যক। ইব্ন সীনা এ কারণে সম্বোধনমূলক, বিতর্কমূলক, বিভ্রান্তিমূলক, সফিষ্ট্রি বা কুতর্কমূলক প্রমাণ প্রয়োগ পদ্ধতিসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শব্দসমূহকে মাকরাদ ও মারকাব-এই দুইভাগে ভাগ করেছেন। এ ভাবে সামগ্রিক তথা ব্যাপক অর্থবোধক এবং আংশিক শুধু একটি অর্থবোধক শব্দ বিভাজন করেছেন তিনি। সত্তা (being) ও অস্তিত্বের (existence) প্রশ্নেও ইব্ন সীনা গভীর মত দিয়েছেন। তিনি জিন্স(জেনাস) বা জাতিবাচক, নাও (স্পেসিস) তথা প্রজাতি বা শ্রেণীবাচক, ফাস্ল বা বিভাজক, খাস্ বা বিশেষত্ব, আর্দ বা অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিয়ে বিশদ আলোচনা রেখেছেন। পদার্থের মৌলরূপ, আকৃতি, স্থিতি, গতিশীলতা ও পূর্ণতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। পদার্থের সঙ্গে যুক্ত গতি, স্থিতি, কাল, স্থান, শূন্যতা, সসীমতা, অসীমতা, স্পর্শন, সংঘবদ্ধতা, সম্মিলন ইত্যাদি নিয়ে গভীর আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। "কিতাবুন নাফ্স" গ্রন্থে ইব্ন সীনা মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় উদ্ভিজ্জ মন, জীব মন, মানব মন নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইব্ন সীনা বলেছেন, মানবীয় মন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর দ্বারা প্রাথমিক অনুভূতিসমূহকে বুদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে পৌঁছায়। মানবীয় মন নিজ সম্ভাবনাসমূহের চরম সীমায় পৌঁছায়। এর ঝোঁক কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণাসমূহের প্রতি হলেও পরিশেষে এটা পরম সৃজনী আক্ল-এর সাথেই মিলিত হয়। ইব্নে সীনা রূহ সম্পর্কেও সুগভীর আলোচনা রেখেছেন। তাঁর মতে রূহ জড়বস্তু নয়। রুহের প্রথম পরিপূর্ণতাই দেহের পরিপূর্ণতা। তাঁর মতে, রুহ আসলে 'বিমূর্ত'।

ইসলামী চিন্তা ঃ ব্যাপ্তি ও গভীরতা

ইব্ন সীনা এবং আল-ফারাবী দু'জনেই ধারণা দেন যে, 'জাত' ও 'ওযুত' পরস্পর থেকে আলাদা। ইব্ন সীনার মতে, আক্ল মুতলাক সৃষ্ট জগত সম্পর্কে অজ্ঞান নন। তাঁর নিজের 'জাত'-এর অনুভূতি তাঁর রয়েছে। এমন অনুভূতির ভিত্তিতে সৃষ্টির অনুভূতিও বিদ্যমান রয়েছে তাঁর। তিনি সমগ্র জ্ঞানায়ত্ত পদার্থ জগতের বাহক। সে কারণে জ্ঞানায়ত্ত পদার্থসমূহের প্রকাশ আল্লাহ থেকেই হয়। আল্লাহই অবশ্যম্ভাবী সত্তা। তিনিই সৃষ্টির রূপ দানকারী। এই আক্ল ফাআল বা সৃজনী আক্ল জ্ঞানায়ত্ত আকারসমূহকে রুহ দান করেন এবং রুহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারসমূহকে বস্তুনিচয়ের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। এ দিকে আল্লাহ

যদি কারণসমূহের কারণ হন, তবে সে ক্ষেত্রে তিনি লক্ষ্যসমূহেরও পরম লক্ষ্য। তদুপরি যেহেতু শেষ কারণ কোনো অন্তে পৌঁছাবেই, সেহেতু এহেন ধারাকে কোথাও সমাপ্ত করা আবশ্যক। ইব্ন সীনা এজন্যে এটাও জানান যে, আমাদের নিকট প্রথম প্রারম্ভের কোনো প্রমাণ নেই। তিনিই স্বয়ং সকল প্রমাণের প্রমাণ। তাঁকে আমরা বুরহানের পথে পেতে পারি না। তাঁর কোনো ইল্লাত, দলীল, সংজ্ঞা নেই। সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর প্রমাণ। তিনিই আউয়াল, আখীর, জাহির, বাতিন। ইব্ন সীনার দর্শনের চিন্তা বা দর্শন এখানে এসেই মিলে যায় ইসলামের সঙ্গে। কেউ বা তার মধ্যে তাসাওউফের সন্ধানও করেন।

ইব্নে সীনা আল্লাহকে কারণসমূহের কারণ, চূড়ান্ত লক্ষ্য, আদি, অন্ত, অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী সত্তা হিসেবে মনে করেন। কাজেই আল্লাহর সত্তা সব রকম ইম্কান, কূওয়াত ও মাদ্দা থেকে পবিত্র নিঃসন্দেহে। আল্লাহ্র নেই আকৃতি, নেই আকৃতির জ্ঞানগত উপাদান বা মাদ্দা মাকূল। তিনি কোনো জ্ঞানগত উপাদানের জ্ঞানগত আকারও নন। তিনি জ্ঞান, ইচ্ছা, জীবন নন। এসব আল্লাহ্র বুনিয়াদী সিফাত নয়। এ সমস্ত সিফাতের সঙ্গে তাঁকে সম্পর্কিত করা হলে তাঁর এককত্বের পরিবর্তন হয় না। মুতাযিলীগণের মতে, এরূপ সিফাতের যোগ আল্লাহ্র ওয়াহদানিয়াতের বিপরীত। এরিস্টটলের দর্শনে পরম সত্তার পরিপূর্ণতা তাঁর গতিহীনতার পরিণাম। অথচ এর একেবারেই বিপরীত শিক্ষা দেয় ইসলাম। ইসলামের বক্তব্য এই যে, আল্লাহ্র জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টিব্যাপী। ইব্ন সীনাও এ কথাই তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ সৃষ্টি সম্পর্কে বেখবর নন, সকল কিছু ও সকল জ্ঞান তাঁর করায়ত্ত। ইব্নে সীনা তাক্দীর তথা অদৃষ্ট বা ভাগ্য প্রসঙ্গে বলেন, 'খায়রুহ শার্রুহু মিনাল্লাহি' অর্থাৎ অদৃষ্টের ভাল ও মন্দ আল্লাহ থেকে আসে। এ ক্ষেত্রে মুতাযিলা ও জাবারিয়াগণের সঙ্গে তিনি একমত নন।

সক্রেটিস ও প্লেটো বিশ্বাস করতেন, প্রতিটি বস্তু হতে সেটাই প্রকাশ পায় যার জন্যে তা সৃষ্ট। এ দু'জনই ন্যায়ধর্মে বিশ্বাসী হলেও তাদের ন্যায়ধর্ম (Justice) শ্রেণী কাঠামো ও মানব অসাম্যের উপর ভিত্তিশীল। সক্রেটিস ও প্লেটো ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠাকল্পে নৈতিক চরিত্রের চিন্তার বিশুদ্ধতাকেই প্রয়োজনীয় ভেবেছেন। এরিস্টটলের মতো ইব্ন সীনাও মনে করেন যে, নৈতিকতার লক্ষ্য হচ্ছে অভ্যাসগতভাবে সৎ গুণাবলী অর্জন করা। কিন্তু ইব্ন সীনা এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও বিশ্বাস করেন যে, ন্যায়ধর্ম, সৌভাগ্য, নৈতিকতা সবকিছুর সঙ্গে 'আক্লুল আউয়াল'-এর উৎসগত ও চূড়ান্ত সার্বিক সম্পর্ক রয়েছে।

ইব্নে সীনার ইলাহিয়াত বা আল্লাহ তত্ত্ব আল ফারাবী ও রাসাইল ইখওয়ানিস সাফার সমন্বয়। তিনি স্বীকার করেন যে, আক্লের সকল পর্যায়ে ঈমান থাকা জরুরী। ঈমান ও আক্লের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে তিনটি বিবেচনা দেখা যায়। (ক) আক্ল ও ঈমান পরস্পর বিরোধী। এ কারণে এ দু'টির মাঝে পার্থক্য রাখা জরুরী। (খ) ঈমান আক্লের পরিপূর্ণ রূপ। কাজেই এটা আক্লকে দেয় পূর্ণতা। (গ) ঈমান কার্যত জ্ঞানের পরিপূর্ণতার কারণস্বরূপ হয়। ইব্ন সীনা এক্ষেত্রে 'খ' মতটির পক্ষে। তাঁর মতে শরীয়াহ্ হিক্মা তথা প্রজ্ঞার বিপরীত বা বিরোধী নয়। এ গুলো পরস্পর সম্পর্কিত।

ইব্ন সীনা বলেন, রাসূলগণের মর্যাদা দার্শনিকদের চেয়ে উপরে এবং ওয়াহহি বা প্রত্যাদেশের অবস্থা হল মহান ও উন্নত এক অনুভূতির। এটি এক পবিত্র শক্তি। ওয়াহয়ী, ইলহাম ও রুইয়া বা সত্যস্বপ্ন আল্লাহ্র প্রজ্ঞার অংশ। ইব্ন সীনার কিতাবুন নাফ্সের শেষ দিকে যেসব অভ্যন্তরীণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কথা রয়েছে, সেটার ইঙ্গিত উল্লিখিত পবিত্র শক্তির দিকে।

শরীয়ার কাজ হলো বিশ্ব মানব সমাজের সংশোধন। এর এক দিকে রয়েছে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, প্রশাসনিক কর্মকান্ড, আর অন্যদিকে রয়েছে আধ্যাত্মিক বিষয়াদি। এ সবের পূর্ণতা সাধনের জন্য নবী-রাসুলদের যে ইখতিয়ার, সেটা অন্য সাধারণ মানুষের সীমা বহির্ভূত। শরীয়ত এবং হিকমত বা প্রজ্ঞার প্রশ্নে ইব্ন সীনার ঝোঁক শরীয়ার দিকে। ইব্ন

সীনা তাই গ্রীসীয় প্লেটোনিক-এরিস্টটলীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েও শেষাবধি ইসলামের সীমার মধ্যে স্বীয় চিন্তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ইব্নে সীনা পরমসত্তা আল্লাহ্কে একান্তই একক সত্তা হিসেবে জেনেছেন। আল্লাহ অভিজ্ঞতার জগতের সকল সাপেক্ষ আর শর্তধর্মী সত্তা অপেক্ষা একেবারেই আলাদা। কেননা আল্লাহ আবশ্যিক অনিবার্য অবশ্যম্ভাবী সত্তা। তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ যৌক্তিকভাবে যুক্ত থাকে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের সাথে। আল্লাহ একমাত্র রব, প্রভু, ইলাহ্। তিনি খালিক আর অন্যরা মাখলুক। তিনি সৃষ্টিকর্তা, অন্যরা তাঁর ইচ্ছায় সৃষ্ট। জীবন-জগতের, আকাশ-জমীনের বস্তুনিচয়ের অনুক্রম যতদূরেই এগোক, সে সবকে শেষাবধি এরূপ এক অনিবার্যতার নীতিতে এসে থামতে হবেই, যার উপর নির্ভরশীল এই অনুক্রম। আর এই অনুক্রমের প্রথম কারণ, নিমিত্ত, লক্ষ্য, উদ্দেশ্যের সঙ্গে আকস্মিকভাবে নয়, বরং অবশ্যম্ভাবীভাবে যুক্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

গ্রীসীয় সংযোগ ও রাষ্ট্রচিন্তা

ইব্নে সীনার সরাসরি রাষ্ট্র চিন্তা সম্পর্কিত কোনো গ্রন্থ নেই। কিন্তু তাঁর দার্শনিক, নীতি বিষয়ক, আধ্যাত্মিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির ভিতরই তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়। ইব্ন সীনার রাজনৈতিক চিন্তার লক্ষ্য ছিল মানবিক সমাজে শান্তি ও পূর্ণতা হাসিল করা। এ লক্ষ্যের পানে এগিয়ে তিনি আল্লাহ্র ধ্যানে বা ইসলামের সত্য সাধনায় সমাধান খুঁজে পান। ইসলামের জীবনবোধকে মেনে নিয়ে, এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাজনৈতিক জীব বা নাগরিক হিসেবে মানুষকে বিচার করেছেন। গ্রীসীয় প্লেটো-এরিস্টটলের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হলেও, পরবর্তীকালের কাছে এ দু'য়ের দর্শন তুলে ধরায় ও ব্যাখ্যায় ভূমিকা রাখলেও ইব্ন সীনার চিন্তায় রাষ্ট্র-রাজনীতির উপরও আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন তথা ইসলামের সিদ্ধান্তের গ্রহণযোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইব্ন সীনা তাঁর লেখার বিভিন্ন স্থানে নীতিশাস্ত, অর্থনীতি, রাজনীতি নিয়ে বহু কথা বলেছেন। প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রন্থের নানা শিক্ষাকে তুলে ধরেছেন। প্লেটোর সংবিধানের বিবর্তন এবং সরকারের শ্রেণীবিভাগ, পরিবর্তন ও বিচ্যুতিকে তিনি লক্ষ্য করেছেন। উচ্চাভিলাষতন্ত্র (টিমোক্রেসী), ধনিকতন্ত্র(অলিগার্কি), গণতন্ত্র (ডিমোক্রেসী) এবং স্বৈরতন্ত্র (টির‍্যানী) ইত্যাদি অসম্পূর্ণ কিংবা আদর্শচ্যুত রাষ্ট্র/সরকারগুলোকে তিনি আল ফারাবীর মতোই ব্যাখ্যায় এনেছেন। কিন্তু ন্যায়ধর্ম ও আদর্শ শাসকের প্রশ্নে ইব্ন সীনা প্লেটোর রিপাবলিকের ও এরিস্টটলের মতো দার্শনিক বা রাজতান্ত্রিক/অভিজাততান্ত্রিক শাসকের নগর রাষ্ট্রের ধর্মের বাধ্যবাধকতা মেনেও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণের সাথে সাথে শরীয়াভিত্তিক শাসকের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। প্লেটোর রিপাবলিকের দার্শনিক রাজা শাসিত আদর্শ রাষ্ট্রের কথা তুললেও এবং প্লেটোর 'দি লজ'-এর ভবিষ্যদ্বক্তার প্রসঙ্গ আনলেও শেষাবধি ইব্ন সীনা শরীয়াভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্রশাসন ও শাসকের পক্ষেই থেকে গেছেন।

আবদুল মওদুদের "মুসলিম মনীষা" এবং আরইউন রোজেনথালের "পলিটিক্যাল থট ইন মিডিয়াভাল ইসলাম" গ্রন্থের এবং ঐতিহাসিক ফিলিপ কে, হিট্রির ব্যাখ্যা থেকে দেখা, ইব্ন সীনা তাঁর পূর্বসূরী আল-কিন্দী ও আল ফারাবী এবং পরবর্তী সময়ের ইব্ন রুশদের চেয়ে আরো সফলভাবে ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে গ্রীক দর্শনের সামঞ্জস্য ঘটিয়েছেন।

প্রাজ্ঞ উপলব্ধি ও শরীয়াভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র

এরপরও মনে হয় এরিস্টটল ফিলোসফী(দর্শন) ও থিওলজী(ধর্মতত্ত্ব)-এর ভিতর স্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করতে পারেন নি। তিনি মেটাফিজিক্স বা অধিবিদ্যাকে দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব উভয় অর্থে ব্যবহার করেছেন। রোজার বেকন অধিবিদ্যাকে ধর্মতত্ত্বের অংশ তথা সাইন্টিয়া ডিভাইনা বা ঐশী বিজ্ঞান হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু, দর্শনের সীমায় প্রবেশ করেও ইব্ন সীনা দর্শন ও ধর্মতত্ত্বকে আলাদা দুই বিষয় হিসেবে দেখেছেন। তিনি বিশ্বাস (ফেইথ) ও

যুক্তির (রিজন) সমন্বয়ের কথা বলেছেন। তা সত্ত্বেও মানবিক মাত্রার দর্শনকে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত প্রত্যাদিষ্ট দ্বীন ইসলামের শরীয়ার অধীনস্থ করে বিবেচনায় এনেছেন। "ফি ইসবাত আন নুবুওয়াহ" গ্রন্থে তিনি নবী-রাসূলদের দ্বিবিধ ভূমিকার কথা বলেছেন। একযোগে একদিকে রাজনৈতিক শাসনের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুনিয়ার মানব সমাজে সুশৃংখল শান্তিপূর্ণ কল্যাণকর অবস্থা আনয়ন করা এবং সেই সঙ্গে পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ লাভে মানুষকে প্রস্তুত করা। মিথ্যা মতবাদেসমূহকে দমন করে শরীয়ার ভিত্তিতেই কেবল আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়।

ইব্নে সীনাকে গ্রীক দর্শনের ইসলামী ভাষ্যকার বলা হয়। তিনি প্লেটোর দর্শনের ইসলামী সংশ্লেষণ করেন এবং এরিস্টটলীয় দর্শনের সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার সংযোগ সাধন করেন বলে গবেষকরা মত দেন। কিন্তু ইব্ন সীনা সম্পর্কে বলা যায়, তিনি "মুক্তবুদ্ধি সঞ্জাত তওহীদবাদে একান্ত বিশ্বাসী, আত্মার অমরতায় আস্থাশীল এবং সৌন্দর্যের চিরপিয়াসী"।

রূপকের গভীরতায় ইসলামী দৃষ্টি

ইব্ন সীনার গোড়ার দিককার রচনাসমূহে মরমী এক রেশ কাজ করেছে। আল ইশারাত, হাই ইবনে ইয়াকজান, পাখি, প্রেম প্রসঙ্গে, নামাজ প্রসঙ্গে, ভাগ্য প্রসঙ্গে গ্রন্থে ইব্ন সীনার মরমীবাদী একটা ছাপ পাওয়া যায়। বাচনভঙ্গি, মেজাজ, নাটকীয় বদল - এসব দিক থেকে উল্লেখিত লেখাসমূহ এরিস্টটলীয় রচনা থেকে আলাদা। এ সব গ্রন্থে রূপক, উপমা, বাগধারা, কল্পনাশক্তি ইত্যাদি প্লেটোর রূপক, উপমার কাছাকাছি যেতে পারে। কিন্তু তবুও তা প্লেটো থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন ধারার ও অন্য অনুভবের। প্লেটোর "ফিড্রাস" ও "রিপাবলিক"-এর গুহার রূপকের (এ্যালিগরি অব কেভ) মাধ্যমে জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যার গল্পটির তুলনায় ইব্ন সীনা তাঁর রচনায় এমন রূপক চিত্রায়নে একবারেই যেন ভিন্ন।

ইব্ন সীনার 'পাখি' নামক রূপক গ্রন্থে সত্যের অনুসন্ধানে আত্মার প্রয়াস-প্রচেষ্টা ও মনজীলে মাকসুদের সন্ধান এবং সেই পথে ইন্দ্রিয়ের দিক থেকে প্রতিবন্ধকতা বা বাধার জালের বিষয়াদি সম্পূর্ণ ভিন্ন অনুভবে উঠে এসেছে।

The Ode on the Soul বা আত্মা বিষয়ে গীতি নামক গ্রন্থে ইব্ন সীনা শরীরের বন্ধনে আত্মার শৃংখলিত হওয়া এবং অবশেষে জ্ঞানের সাহায্যে আত্মার মুক্তির কাহিনী বিবৃত করেছেন। এখানে মানবাত্মাকে খাঁচায় বন্দী কিছু পাখিরূপে দেখানো হয়েছে। এরা তাদের বন্দীত্ব মেনে নিতে রাজী নয়। এরা সদা তৎপর মুক্তির অন্বেষায়। এসব বন্দী পাখির কয়েকটি একদা কোনোক্রমে পলায়নে সক্ষম হয়। এরপর তারা উদ্ধার করে অন্য পাখিদের। এরপর মুক্তির লক্ষ্যে তারা যাত্রা শুরু করে। লক্ষ্যস্থল তাদের এক আটতলা পর্বত। বন্দীদশা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত বিহঙ্গরা একে একে সেই পর্বতের সাত তলায় গিয়ে দেখতে পায় অদ্ভূত সুন্দর তৃণলতা খচিত সবুজ এক প্রান্তর এবং এরই পাশ দিয়ে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা বা স্রোতস্বীনী। তারা এখানে বিশ্রাম নিতে থাকে মনের সুখে। এভাবে কিছুকাল বিশ্রাম নেবার পর তারা অনুভব করে আরো উপরে উঠা দরকার। আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে তারা পৌঁছে যায় সেই পর্বতের আটতলা উচুঁতে। সেখানে তারা অবলোকন করে অনিন্দ্য সুন্দর কিছু পাখি। এমন পাখি তারা আগে দেখে নি কোনোদিন।

আনন্দের জগতের যাত্রী আট তলায় আগত পাখিরা পরিচয়, ভাব বিনিময় ও গভীর বন্ধুত্ব গড়ে তোলে এ সব নতুন পাখির সঙ্গে। স্বাগতিক পাখিরা তাদের অতিথিদের দুঃখ-ক্লেশহীন সুখের সন্ধান দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে যায় সম্রাটের দরবারে। কিন্তু সম্রাটের উজ্জ্বল উপস্থিতির দিকে তাকানোর সাথে সাথে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে। তারা বিমুগ্ধ আনন্দিত হয়ে পড়ে। আগত পাখিরা সম্রাটের কাছে তাদের এতদিনকার যাবতীয় নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনায় ভরা জীবনের কাহিনী তুলে ধরে। সম্রাট তাদের কাহিনী অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে শুনলেন। মুক্ত ও শান্তিময় জীবনের আশ্বাস দিলেন তাদের। ইব্ন সীনার বর্ণিত রূপকে সুন্দর ও কল্যাণের আধার সত্তা(আল্লাহ রাব্বুল আলামীন)-এর সাথে দীদারের

ফলে পাখিরা অভাবনীয় আনন্দ ও সুখের অনুভূতি পেলো। তারা ভুলে গেল পার্থিব জীবনের সকল দুঃখ-বেদনা-নিগ্রহের কথা। তারা সন্ধান পেলো দুঃখহীন পরম কাঙ্খিত সেই আনন্দময় জীবনের।

মূল্যায়ন

প্লেটোর রূপকের সঙ্গে ইব্ন সীনার এই রূপকের পার্থক্য মৌখিক। গ্রীসীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, এর ভাষ্য তুলে ধরলেও ইব্ন সীনা সত্যিকার অর্থেই মানবিক সীমানার যে অনিত্য অসম্পূর্ণতার দর্শন চর্চা তার উর্ধ্বে উঠে আল্লাহ্‌র দেয়া একমাত্র সত্য বিধানকেই মেনে নিয়েছেন। ইসলামী শরীয়ায় বিশ্বাস এবং এর ভিত্তিতে রাষ্ট্র, সমাজ, সরকার এবং সমগ্র মানবজীবন পরিচালনা করে পার্থিব ও পারলৌকিক জগতের কল্যাণ ও কামিয়াবী অর্জন তাই ইব্ন সীনার চিন্তা মানচিত্রের মৌল অভিব্যক্তি, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

সারকথা

ইব্ন সীনার রাজনৈতিক চিন্তার লক্ষ্য ছিল মানবিক সমাজে শান্তি ও পূর্ণতা হাসিল করা। এ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে তিনি আল্লাহ্‌র ধ্যানে তথা ইসলামের সত্য সাধনায় সমাধান খুঁজে পান। ইসলামের জীবনবোধকে মেনে নিয়ে, এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাজনৈতিক জীব বা নাগরিক হিসেবে মানুষকে বিচার করেছেন। গ্রীসীয় প্লেটো-এরিস্টটলের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হলেও, পরবর্তীকালের কাছে এ দু'য়ের দর্শন তুলে ধরায় ও ব্যাখ্যা প্রদানে ভূমিকা রাখলেও ইব্ন সীনার চিন্তায় রাষ্ট্র-রাজনীতির উপর আল্লাহ্‌ প্রদত্ত দ্বীন তথা ইসলামের সিদ্ধান্তের গ্রহণযোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি রয়ে যান শরীয়াভিত্তিক ইসলামী আদর্শ রাষ্ট্র ও শাসকের পক্ষে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। ইবনে সীনা কোন গ্রন্থটি পড়ে দর্শন শাস্ত্রে পারদর্শী হন?
ক) আল ইবানা;
খ) দি রিপাবলিক;
গ) সোশাল কন্ট্রাক্ট;
ঘ) রুবাইয়াত।

২। কত বছর বয়সে ইবনে সীনা কোরআনে হাফীজ হন?
ক) ১১ বছর বয়সে;
খ) ৯ বছর বয়সে;
গ) ১০ বছর বয়সে;
ঘ) ১২ বছর বয়সে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। যুক্তির সাথে বিশ্বাসের সমন্বয় কথাটির অর্থ কি?
২। ইসলামী রাষ্ট্র চিন্তার অর্থ কি?
৩। ইবনে সিনা কি একজন ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ছিলেন?
৪। ইবনে সিনা প্লেটো এবং এরিস্টটলকে কিভাবে মুল্যায়ন করেছেন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ইবনে সিনার রাষ্ট্রচিন্তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

সঠিক উত্তর

১। ক, ২। ঘ

পাঠ-৬

ইমাম আল গায্যালী (রহ:) (১০৫৮-১১১১)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- ❑ ইমাম গাযালীর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করতে পারবেন।
- ❑ ইমাম গাযালীর রাষ্ট্রদর্শন বর্ণনা করতে পারবেন।

আবু হামিদ মুহম্মদ ইবনে আল গায্যালী (রহ:) ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে খোরাসানের অন্তর্গত তুষ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামের এক সংকট কালে চিন্তাবিদ গাযালীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি ইসলাম পরিপন্থী সকল প্রকার অপশক্তি থেকে ইসলামকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হন। অল্প বয়সেই তিনি কোরআন ও হাদিসের জ্ঞান আয়ত্ব করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য নিশাপুর গমন করেন। সেখানে তৎকালীন প্রখ্যাত আলেম ইমামুল হারমাইনের তত্ত্বধানে বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। ইমাম গাযালী (রা:) তাঁর সান্নিধ্যে থেকে অল্পদিনের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ আলিম হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ইমামুল হারমাইন তাঁর ছাত্রের সুখ্যাতিতে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন।

বাগদাদের প্রধানমন্ত্রী নিজামুল মূলক গাযালীরগুণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে বাগদাদের বিখ্যাত নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। উক্তপদে তিনি মাত্র ৪ বছর বহাল থেকে খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেন। ইমাম গাযালীরখ্যাতি শুধু মুসলিম বিশ্বেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা ছিল বিশ্বব্যাপী। তাঁর মূল্যবান গ্রন্থগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। মৌলিক অবদানের জন্য গাযালী অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ বলে স্বীকৃত। বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ইমাম গাযালী ৮১ খানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে '*এহ্ ইয়াউ উলুমুদ্দীন*' অমর গ্রন্থ। এ পুস্তক তাঁর জীবনের কঠোর সাধনালব্ধ চিন্তাধারার এক বাস্তব, সার্থক এবং সমুজ্জ্বল নিদর্শন। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মইনুদ্দীন ইরাকী বলেন,' "ইমাম গাযালীর *এহ্ ইয়াউ উলুমুদ্দীন* গ্রন্থখানা মুসলিম জাহানের সর্বশ্রেষ্ট রচনা।" তিনি সমস্ত ভ্রান্ত ও অসার বিষয়গুলো সংশোধন করেছিলেন। অধ্যাপক ম্যাকজেনাল্ড এবং ডি বেয়ারের মতে গাযালী নি:সন্দেহে ইসলামের শ্রেষ্ট চিন্তাবিদ। ইসলামী মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে তাঁর নাম শীর্ষস্থানীয়।

শাসকের যোগ্য শাসনে সমাজ হবে উন্নত ও সুন্দর

ইমাম গাযালী (রহ:) ইসলামকে আল্লাহর কোরআন ও রাসুলের হাদিসের শিক্ষার ভিত্তিতে পুন;প্রতিষ্ঠিত করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর অবিরাম সাধনা ও প্রশংসনীয় অবদানের জন্য তাঁকে হজ্জাতুল ইসলাম বা ইসলামের রক্ষক বলা হয়। তিনি দর্শনের উপর ধর্মের প্রধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তারঁ মতে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় না। তিনি উল্লেখ করেন যে, মানুষের হৃদয়ে এমন একটি শক্তি আছে যার মাধ্যমে সে সত্যের জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। তাঁর এ বক্তব্য বস্তুবাদী ও অভিজ্ঞানবাদী দর্শনের বিপরীতে আদর্শিক ও ভাববাদী দর্শনের প্রতি এক জোড়ালো সমর্থন প্রকাশ পেয়েছে। ইমাম গাযালী (রহ:) প্রকৃত সত্যের সন্ধানে দশ বছর যাবৎ বিভিন্ন স্থানে সফর করেন। তিনি মদিনায় এসে আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন হন। তাঁর মনে হল তিনি যা কিছু লিখেছেন এবং যা কিছু অর্জন করেছেন তা তাঁর জন্য যথেষ্ট নয়। তাঁর মতে গভীর তন্ময় অবস্থায় হৃদয়ের অনুভূতির মাধ্যমেই পরম সত্তার জ্ঞান লাভ করা যায়। জীবনের শেষ দিকে ইমাম গাযালী

(রহ:) উজীরে আযম ফকরুল আলমের অনুরোধে ১১০৫ খ্রিষ্টাব্দে নিশাপুর মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। অবশেষে তিনি জন্মস্থান তুষ নগরে ফিরে আসেন। তিনি অধ্যাত্মিক সাধনা ও দীক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। খ্যাতনামা সুফিসাধক, দার্শনিক ইমাম গাযালী (রা:) ১১১১ খ্রি: ইন্তেকাল করেন।

রাষ্ট্রদর্শন

ইমাম গাযালী রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও শাসকের গুণাবলী সম্পর্কিত তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত রাষ্ট্রীয় দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবোচিত হয়ে আসছে। তিনি গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলকে অনুসরণ করে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, মানুষের পারস্পরিক স্বত:স্ফূর্ত সাহায্য ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। তাঁর মতে ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজ এক অবিচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ। সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ও জীবনের নিরাপত্তা বজায় রাখতে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটলের ন্যায় গাযালী উল্লেখ করেন যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে সাধারণ জীবন যাপনের জন্য এবং উন্নত জীবন যাত্রার লক্ষ্যে তা বিদ্যামান আছে। তিনি আরও বলেন যে, সুন্দর জীবন যাপনের জন্য সৃষ্টিকর্তার বিধি-বিধান বা নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন। সমাজের শান্তি ও অগ্রগতি অক্ষুন্ন রাখার জন্য সুশৃঙ্খল ও দক্ষ শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন।

ইমাম গাযালী *"তিবরুল মসবুক"* গ্রন্থে শাসকের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,"শাসক হবেন ধর্মপ্রাণ, জ্ঞানী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও সুবিচারক। তাঁর নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণ নিরাপত্তা লাভ করবেন। তাঁর মতে শাসক হবেন একজন পরাক্রমশালী ব্যক্তি। শাসকের যোগ্য শাসনে সমাজ হবে উন্নত ও সুন্দর।আদর্শ শাসক পরম নিষ্ঠার সাথে স্রষ্টার নির্দেশ অনুসরণ করবেন এবং প্রেরিত মহামানবের দৃষ্টান্ত ও নীতি অনুসারে শাসন কার্যাদি পরিচালনা করবেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, শাসকের ক্ষমতা কোন ক্রমেই সীমাহীন হবে না। তাঁর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হবে আল্লাহর আইন ও শরিয়তের বিধান ও সমাজ জীবনের প্রচলিত মৌলিক নীতিমালা দ্বারা। সুতরাং তিনি পার্থিব এবং অপার্থিব উভয় জগতকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজ এক অভিচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ

তাঁর মতে, ন্যায়পরায়ন শাসক আল্লাহর প্রতিনিধিস্বরূপ। অন্যায়কারী শাসক শয়তানের প্রতিনিধি। শাসন ব্যবস্থায় তিনি কোনরূপ স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় দেন নি। ইমাম গাযালী *ইকতিসাদ* নামক গ্রন্থে বলেন যোগ্য শাসক না থাকলে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। সমাজ সীমাহীন দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ন্যায়নীতির সুষম প্রয়োগ অপরিহার্য। ইমাম গাযালী ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স:) কে একজন ন্যায়পরায়ন ও আদর্শমন্ডিত শাসক হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি শাসকগোষ্ঠীকে হযরত মুহাম্মদ (স:) এর আদর্শ ও নীতি অনুসরণ ও অনুকরণ করার কথা বলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় সত্তাকে মানব দেহের সাথে তুলনা করে বলেন যে, মানব দেহের বাদশাহ হচ্ছে বিবেক। এর নিয়ন্ত্রণে থাকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রীয়শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ শাসকের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এক্ষেত্রে শাসকের যোগ্যতার অভাবে রাষ্ট্রে অশান্তি ও অস্থিরতা বিরাজ করে। তিনি মানুষের দুই প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন যে, এ প্রবণতা থেকে সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তাই তিনি প্রয়োজন বোধে বল প্রয়োগ করে হলেও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছেন।

মানব দেহের বাদশাহ হচ্ছে বিবেক

সারকথা

ইমাম গাযালী (রহ:) ইসলামকে কোরআন ও হাদিসের ভিত্তিকে পুণ: প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দর্শনের উপর ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ইসলাম ধর্মের

ব্যাখ্যাকারী হিসেবে তাঁর নাম শীর্ষস্থানীয়। ইমাম গাযালী (রহ:) মতে গভীর তন্ময় অবস্থায় হৃদয়ের অনুভূতির মাধ্যমে পরম সত্তার জ্ঞান লাভ করা যায়। তাঁর প্রশংসনীয় অবদানের জন্য তাঁকে হুজ্জাতুন ইসলাম বা ইসলামের রক্ষক বলা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। ইমাম গাযালী (রহ:) কার তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন?
(ক) ইমামুল হারমাইন; (খ) আল ফারাবী;
(গ) ইবনুল আরাবী; (ঘ) ইমাম আবুহানিফা।

২। গাযালীর কোন গ্রন্থটি অমর গ্রন্থ হিসেবে সুপরিচিত?
(ক) *রুবাইয়াত;* (খ) *মসনবী;*
(গ) *তিবরুল মসবুক;* (ঘ) *এহ ইয়াউ উলুমুদ্দীন।*

৩। গাযালীর মতে পরম সত্তার জ্ঞান লাভ করা যায় কিভাবে?
(ক) যুক্তির মাধ্যমে; (খ) স্বজ্ঞার মাধ্যমে;
(গ) জ্ঞানের মাধ্যমে; (ঘ) প্রজ্ঞার মাধ্যমে।

৪। গাযালী শাসকের গুণাবলীর চিত্রঅংকণ করেছেন কোন গ্রন্থে ?
(ক) *এহ ইয়াউউলুমুদ্দীন;* (খ) *তিররুল মসবুক;*
(গ) *ইকতিসাদ;* (ঘ) *কিময়ায়ে সাআদাত।*

উত্তরমালা- ১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। খ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন:

১। ইমাম গাযালীকে হুজ্জাতুল ইসলাম বলা হয় কেন?
২। গাযালী কিভাবে খ্যাতির শীর্ষে আরহণ করেন?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। ইমাম গাযালীর রাষ্ট্রদর্শন আলোচনা করুন।

পাঠ-৭

ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ❑ ইবনে খালদুনের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ❑ খালদুনের আসাবিয়া বা গোষ্ঠী সংহতিতত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- ❑ সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ইবনে খালদুনের অভিমত ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ❑ রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে খালদুনের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খালদুন ধর্মতত্ত্ব, আইন, কলা, বিজ্ঞান দর্শন সমাজতত্ত্বের বহুবিধ শাখায় শিক্ষা লাভ করেন

কালজয়ী চিন্তাবিদ ও বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ইবনে খালদুন ছিলেন একাধারে দার্শনিক, ইতিহাসবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানী। তাঁর পূর্ণ নাম ওয়ালী উদ্দিন আবু যায়দ আবদুর রহমান ইবনে মোহাম্মদ ইবনে খালদুন। তিনি ১৩৩২ সালে ২৭ মে, উত্তর আফ্রিকার তিউনিস শহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। শৈশবে পিতার তত্ত্বাবধানে তিনি তিউনিস নগরীতে লেখাপড়া শুরু করেন। তিনি ইবনে খালদুনকে ধর্ম, দর্শন ও ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। ইবনে খালদুন অল্প বয়সেই পবিত্র কুরআন মুখস্ত করেন। সুযোগ্য শিক্ষকদের নিকট থেকে তিনি ধর্মতত্ত্ব, আইন, কলা, বিজ্ঞান, দর্শন ও সমাজতত্ত্বের বহুবিধ শাখায় শিক্ষা লাভ করেন। তিউনিসের সুলতান আবু ইসহাক ইব্রাহীম তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে মাত্র বিশ বছর বয়সে তাঁকে রাজদরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। তাঁর সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী মন এবং অদম্য জ্ঞান পিপাসা তাঁকে বারবার এক দেশ থেকে আর এক দেশে টেনে নিয়েছে। এক সময় তিনি গ্রানাডায় গমন করেন। গ্রানাডার সুলতান মোহাম্মদ ইবনে খালদুনের সূক্ষ্ম কুটনীতি জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ক্যাস্টিলের রাজা পেড্রোর দরবারে রাষ্ট্রদূত হিসাবে প্রেরণ করেন। তিনি গ্রানাডায় মাত্র দুই বছর অবস্থান করার পর পুনরায় তিউনিসে ফিরে যান এবং প্রত্যক্ষ রাজ কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েন। অতঃপর রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি সালামার নির্জন দূর্গে জ্ঞান সাধণায় মগ্ন হন। তিনি ইতিহাস, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা করেন। দীর্ঘ চার বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৩৮০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *আলমুকাদ্দিমা* রচনা করেন। এই গ্রন্থটি বিশ্বের জ্ঞানভান্ডারে এক অমূল্য সম্পদ।

১৩৮২ সালে তিনি মিশরের রাজধানী কায়রো যান। এবং আলআজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৩৮৪ সালে তিনি মিশরে বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং আইন শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন। তাঁর অসধারণ পান্ডিত্যের কারণে তিনি মিশরের কাযীউল কুয়ত বা প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। এই সম্মানিত পদে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তিনি ১৪০৬ সালে মিশরে ইন্তেকাল করেন। রাষ্ট্রদর্শনে তাঁর মৌলিকত্ত্ব, সর্বজনীনতা এবংঅভিনবত্বের কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ তাঁকে প্রাচ্যের এরিস্টটল বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনে খালদুন জীবনে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তার সুস্পষ্ট ছাপ তাঁর রচনাবলীতে পরিলক্ষিত হয়। কথিত আছে তাঁর যুক্তিবাদী দার্শনিক মতবাদের জন্যতৎকালীন আলেম সমাজ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে।

ইবনে খালদুনের রাজনৈতিক দর্শনে মৌলিক অবদান হল - (১) আসাবিয়া বা গোষ্ঠী সংহতি।(২) রাষ্ট্রের উৎপত্তি (৩) রাষ্ট্রের প্রকারভেদ ও স্বাভাবিক আয়ুস্কাল (৪) রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি (৫) ইতিহাসের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা (৬) সমাজ বিজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক।

ইবনে খালদুনের আসাবিয়া বা গোষ্ঠী সংহতি তত্ত্ব

সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ইবনে খালদুনের আসাবিয়া তত্ত্ব রাস্ট্রদর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উত্তর আফ্রিকার কতকগুলো উদাহরন ধরে ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিবর্তনকে এ সংহতি বৈশিষ্ট্যের মানদন্ডে তিনি প্রমান করেছেন যে 'আসাবিয়া সংহতির শক্তিই একটি সামগ্রিক নৈতিকতার আদর্শবাদকে বাস্তবায়ন করার শক্তি। আসাবিয়া মানব হৃদয়ের এমন এক অনুভূতি যা পরিবার, গোত্র ও জাতি সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে। তিনি গোষ্ঠী সংহতি ও একাত্মতার চেতনাকে আসাবিয়া বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে গোষ্ঠী সংহতি থেকেই রাষ্ট্রীয় শক্তির মূল অনুপ্রেরনা অর্জিত হয়। ইবনে খালদুন একটি ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠীকে বুঝাবার জন্য 'আসাবিয়া' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মানুষের মনে সহযোগিতার অভিপ্রায় জাগ্রত করানোর জন্য অনুপ্রেরনা থাকা অপরিহার্য। এই অনুপ্রেরনাকে তিনি আসাবিয়া বলে উল্লেখ করেছেন। 'আসাবিয়া' তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে অধ্যাপক রোজেন্থাল উল্লেখ করেন, "কোন ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে অভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ কতকগুলো সমভাবাপন্ন মানুষের সক্রিয় সমর্থন প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্যায়ে বংশগত ও পারিবারিক বন্ধনের কারণে গোষ্ঠী সৃষ্টি ও তা সংহত হয়। এর ফলে যে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা ঘটে তা ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াসের মধ্যদিয়ে প্রকাশ পায়। আর এই গোষ্ঠীচেতনা রাষ্ট্র ও রাজবংশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইবনে খালদুন একেই 'আসাবিয়া' বলে অভিহিত করেন।" আর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে এর মূল লক্ষ্য।

রাষ্ট্রের পক্ষ শক্তি ছাড়া মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠে।

ইবনে খালদুনের মতে 'আসাবিয়া' বা গোষ্ঠী সংহতি ধর্মীয় বা ধর্মনিরপেক্ষ এ দুটি নীতির যে কোন একটির ভিত্তিতে গঠিত হতে পারে। সমাজ ও রাস্ট্রের ঐক্য ও সংহতি স্থাপনে ধর্মের প্রভাব অপরিসীম। নবী বা রাসুলগণ যে ধর্মীয় মিশন নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন ধর্মীয় প্রচন্ড ঐক্য বিধানকারী শক্তি নিহিত থাকে। তিনি উল্লেখ করেন যে ধর্মীয় প্রেরনায় উদ্বুদ্ধ না হলে আরবজাতির পক্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো না। বর্তমান বিশ্বে আমরা যে জাতি রাষ্ট্রের সংগে পরিচিত তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ নীতির ভিত্তিতে গোষ্ঠী সংহতির মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। এ সব রাষ্ট্রকে তিনি বলতে চান ক্ষমতাভিত্তিক রাষ্ট্র। ইবনে খালদুন উল্লেখ করেন, গোষ্ঠীর উন্মেষ ঘটে পরিবার বা গোত্রীয় আত্মীয়তা বোধের মাধ্যমে। তারপর গোত্রীয় এলাকা সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। আর এই সংহতি গড়ে উঠে ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এভাবে একটিমাত্র গোষ্ঠীকেন্দ্রিক মানুষের স্থলে উদ্ভব ঘটেছে একাধিক গোষ্ঠী মানুষের। আর এসব বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে দেখা দেয় অনিবার্য সংঘাত। একটি গোষ্ঠী যখন অন্য একটি গোষ্ঠীর উপর বিজয় লাভ করে, তখনই ঐ গোষ্ঠীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বল প্রয়োগ অন্য সকল ক্ষমতাকে পরাজিত করে। আর অন্য সব গোষ্ঠীর উপর চূড়ান্ত ভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে। তাঁর মতে এভাবে সংঘাত তত্ত্বের সূচনা হয়েছে। ইবনে খালদুনের মতে প্রত্যেক রাষ্ট্রই অন্যসব রাষ্ট্রের উপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কাজেই তাদের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। শক্তিমান গোষ্ঠী দখল করে নেয় অন্যসব রাষ্ট্র। এরই ফলে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাজ ও রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি স্থাপনে ধর্মের প্রভাব অপরিসীম

সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে খালদুনের অভিমত

ইবনে খালদুন রাষ্ট্রতত্ত্ব বিশ্লেষণে যে ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। তিনিই মধ্যযুগের প্রথম চিন্তাবিদ যিনি রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের সকল কাল্পনিক তত্ত্বকে অযৌক্তিক বলে ঘোষণা করেন। তাঁর মতে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনের তাগিদে এবং পারস্পরিক সহযোগীতাও নির্ভরশীলতা থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। খালদুনের মতে রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে 'সংহতি' বা আসাবিয়াত। এই সংহতি বিভিন্ন সম্পর্কযুক্ত কারণে সংঘটিত হয়। তিনি

সমাজ-জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করেছেন। মানুষ ও অন্যান্য জীবের পার্থক্য হলো যে, মানুষ বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী দ্বিতীয়ত, মানুষ ক্ষমতার এক শাসকের নিয়ন্ত্রনে সুস্থ জীবন-যাবনে আগ্রহী। তৃতীয়ত, জীবন ধারনের প্রয়োজনে মানুষ সংঘবদ্ধভাবে থাকতে আগ্রহী। এরিস্টটলের ন্যায় তিনি বলেন যে, মানুষ স্বভাবত সামাজিক জীব, সমাজ ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক জীবন যাপন করা সম্ভব নয়।

মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনের তাগিদে এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে।

ইবনে খালদুনের মতে মানুষের জীবনে সীমাহীন চাহিদা রয়েছে। অথচ এই চাহিদা মিটানোর ক্ষমতা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। চার্লস ইসাভী ইবনে খালদুনের আল মুকদ্দিমার সূত্র ধরে বলেন,"শুধু মাত্র এক দিনের জীবন যাত্রার কথা যদি ধরা যায় তাহলে দেখা যায় যে, এই এক দিনের বাঁচার জন্য খাদ্যের দরকার। এর জন্য গম, গম ভাংগানোর যন্ত্র, রুটি তৈরি এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি আবশ্যক। এর অর্থ এই দাড়ায় যে, এক দিনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য শ্রমিক, পাচক, ছুতার, কামার, কুমার, কারিগর, বিভিন্ন জনবলের প্রয়োজন। কিন্তু কোন একজন মানুষের পক্ষে এই বহুমুখী চাহিদা এককভাবে মেটানো সম্ভব নয়। এ কারনে এর জন্য দরকার হয় আসে-পাশের মানুষদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যৌথভাবে কাজ করা। সকলে মিলে মিশে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে চাহিদার চেয়ে বেশি উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।" খালেদুনের মতে, মানুষের এই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মনোভাব থেকে সমাজ গড়ে উঠেছে। কিন্তু সামাজে সকল মানুষ যুক্তি ও শুভ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় না। কিছু সংখ্যক লোক পশু-সুলভ প্রবৃত্তির তাড়নায় সমাজে নানা রকম অন্যায়, অবিচার, জুলুম, করার চেষ্টা চালায়। সমাজে শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত করে। তাই সমাজে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের দমনকল্পে এবং প্রয়োজনের তাগিদে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সমাজে অপরাধ প্রবণতা ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দমন করা যায় না। রাষ্ট্রের পক্ষে শক্তি ছাড়া মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠে। রাষ্ট্রের মাঝেই মানুষ নিজেকে বিকশিত করে। ইবনে খালদুন রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। বস্তুর সাথে আকারের যে সম্পর্ক সমাজের সাথে রাষ্ট্রের যে সম্পর্ক। সমাজ ছাড়া রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না। তিনি বলেন, কেননা সমাজ ব্যতীত মহান রবের খিলাফতের দায়িত্ব সম্পাদন করা মানুষের পক্ষে সমম্ভবপর নয়।

আল্লাহ্‌র খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য সমাজের প্রয়োজন।

রাষ্ট্র ও সরকার

ইবনে খালদুন রাষ্ট্র বা সরকারকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন (১) ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্র (২) যুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্র এবং (৩) দার্শনিকদের আদর্শ রাষ্ট্র (সিয়াসা মাদানিয়া বা মাদানী ফাযিলা)। তাঁর মতে মানুষের উপর শাসকের কর্তৃত্ব স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, আর পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে মানুষের যে ধর্ম বিশ্বাস রয়েছে, সে বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাদের কাছে আনুগত্য দাবি করা হয়। এ ধরনের রাষ্ট্রকে তিনি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করেন। আবার এমন রাষ্ট্র রয়েছে যা যুক্তিভিত্তিক আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে শাসকগণ আইনের মাধ্যমে তাদের থেকে আনুগত্য দাবি করে। তাঁর মতে, এ ধরনের রাষ্ট্রকে যুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্র বলে। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ইহকাল ও পরকাল উভয়েই সুফল লাভ করা যায়। কিন্তু যুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্রে শুধু ইহকালেই সুফল লাভ করা যায়। তৃতীয় ধরনের রাস্ট্র সিয়াসা মাদানিয়া বা আদর্শ রাষ্ট্র সর্ম্পকে তিনি বলেন, "প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্য তাদের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে অবশ্য করণীয় কি, তা নির্ধারণ করা। এরূপ নির্ধারণের উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে আদৌ কোন শাসকের প্রয়োজন না হয়। এ ধরনের রাষ্ট্রকে আদর্শ রাষ্ট্র বলা হয়। দার্শনিকদের ধারণা অনুসারে আদর্শ রাষ্ট্র খুব একটা দেখা যায় না। দার্শনিকগণ শুধু কল্পনার উপর ভিত্তি করে আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন। এর বাস্তব প্রতিফলন সম্ভবপর নয়।"

রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি

ইবনে খালদুন হচ্ছেন অন্যতম চিন্তাবিদ যিনি রাষ্ট্রনীতিতে এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংগঠিত সমাজের সার্বিক জীবনে অর্থনীতির গুরুত্বের বিষয় উপলব্দি করেন। ইবনে খালদুন মনে করেন যে, কোন দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে তার বলিষ্ঠ অর্থনীতি। সমাজ ঐক্যবদ্ধ থাকে সুস্থ অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে। অর্থনৈতিক কারণে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের রূপ পরিবর্তিত হয়। তিনি উল্লেখ করেন করভার যখন লঘু হয় তখন মানুষের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ অধিক মাত্রায় শাসকদের প্রতি আনুগত্য দেখায়। কিন্তু করের বোঝা যখন বেশি হয় তখন কর্মস্পৃহা হ্রাস পায়। তার ফলে উৎপাদনের মাত্রা কমে যায়। জীবনযাত্রার মানে নিম্নগতি দেখা দেয়। ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনেও এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। যারা একদিন রাজাকে সমর্থন করতেন তারা তখন তাকে পরিত্যাগ করেন। যার ফলে একদিন রাজার বংশ ও রাষ্ট্র উভয়েরই পতন ঘটে।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে তার বলিষ্ঠ অর্থনীতি

ইবনে খালদুন হযরত মুহাম্মদ (স:) এবং তাঁর চারজন খলিফা কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলামী অর্থনীতিকেই আদর্শ অর্থনীতি বলে মনে করেন। কারণ, এই অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর বাণী কুরআন এবং মহানবীর হাদিস। আল্লাহ প্রদত্ত বিধানবলে জনগণ স্বত:স্ফূর্তভাবে এই করব্যবস্থাকে মেনে নেয়। এ ব্যবস্থায় করভার অত্যন্ত লঘু হয়ে থাকে এবং রাষ্ট্রকর্তৃক সম্পদের সুষ্ঠু ও ন্যায় সঙ্গত বন্টনের জন্য প্রয়াস চালানো হয়। তিনি বলেন যে সুখী ও সমৃদ্ধশালী স্থিতিশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী কর ব্যবস্থা সর্বোত্তম পদ্ধতি। তা'ছাড়া ইসলাম ধর্মীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর করা হলে সমাজকে দুর্নীতি ও শোষণমুক্ত করা যায়। ফলে ক্রমশ সমাজ থেকে দারিদ্র বিমোচনের পথ উম্মুক্ত হয় এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

সুখী ও সমৃদ্ধশালী স্থিতিশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী কর ব্যবস্থা সর্বোত্তম পদ্ধতি

ইবনে খালদুন তাঁর বিশ্ব ইতিহাসের মধ্যে শুধু যে রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে অর্থনীতি আলোচনা করেছেন তাই নয় উক্ত গ্রন্থে তিনি মূল্য তত্ত্ব, যোগান ও চাহিদা তত্ত্ব, আমদানী ও রফতানী ইত্যাদি বিষয়ে ও আলোচনা করেছেন। অর্থনৈতিক গবেষণায় ইবনে খালেদুনের এ মৌলিক অবদানের কথা স্মরণ করে শেরওয়ানী বলেন, "আমরা যদি ইবনে খালদুন কর্তৃক প্রবর্তিত অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলোর গভীরে প্রবেশ করি তাহলে দেখতে পাব যে, তিনি তাঁর যুগের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রগামী ছিলেন।"

সারকথা

ইবনে খালদুন তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে গোষ্ঠী সংহতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর এ সংহতি গড়ে উঠে ইতিহাসের ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্রদর্শন বিশ্লেষণে তিনি ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, যে কোন দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে তার বলিষ্ট অর্থনীতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। ইবনে খালদুন কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন?
(ক) ১৩৩২; (খ) ১৩৩৪;
(গ) ১৩৮০; (ঘ) ১৩৮২।

২। ১৩৮২ সালে তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন?
(ক) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়; (খ) বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়;
(গ) আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়; (ঘ) জাইতুন বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। মানুষের সাভাবিক জীবনের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে -এই উক্তিটি কে করেছেন?
(ক) হব্‌স্; (খ) জনলক;
(গ) রুশো; (ঘ) ইবনে খালদুন।

৪। ইবনে খালদুন রাষ্ট্রকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন?
(ক) ২ টি; (খ) ৩ টি;
(গ) ৫ টি; (ঘ) ৪ টি।

৫। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে–
(ক) শান্তি শৃঙ্খলা; (খ) জাতীয় সংহতি;
(গ) রাষ্ট্রীয় সংহতি; (ঘ) বলিষ্ঠ অর্থনীতি।

উত্তরমালা ঃ ১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। খ ৫। খ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। ইবনে খালেদুনের জীবনী সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করুন।
২। আসাবিয়া বা গোষ্ঠী সংহতি বলতে কি বুঝেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রদর্শন আলোচনা করুন।

পাঠ-৮

ইব্‌নে খালদুনের ইতিহাস ও সমাজ দর্শন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইতিহাসের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ইতিহাসের সাথে সমাজ বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিষয়ে ইবনে খালদুনের দর্শন বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ইব্‌নে খালদুনের প্রতিভার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর ইতিহাস দর্শনের মধ্যে। ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বৈজ্ঞানিক মতবাদ আধুনিক বিদগ্ধ সমাজে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনি ইতিহাসের যে যুক্তিবাদী ও বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দান করেছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসকে তাঁর উপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিক ও বস্তুতান্ত্রিক বিবর্তনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইতিহাসকে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করার মানসে ভল্টেয়ার, মন্টেস্কু, গিবন প্রমুখ পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ ইতিহাসের যে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা দান করেন তা মুসলিম মনীষী ইবনে খালেদুনের কাছ থেকে প্রাপ্ত। ইতিহাসকে তিনি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি, বংশ বা কালের প্রেক্ষিতে বিচার না করে বিচার করেছেন শ্বাশত ও সর্বজনীন মানবসভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে। তিনিই সর্ব প্রথম ইতিহাসের বিবর্তনবাদী প্রকৃতিকে আবিস্কার করেছেন। ইতিহাস সম্পর্কে ইবনে খালদুনের যুক্তিবাদী ও বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা ইতিহাস সম্পর্কে আগের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। তিনি বলেন যে, মানব সমাজের নির্ভুল ইতিহাস রচনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এজন্য ইতিহাসবিদকে নিরপেক্ষ হতে হয়। ইবনে খালেদুনের রচনাবলীর মধ্যে *'কিতাবুল ইবার'* নামক ইতিহাসদর্শন গ্রন্থটি অমর কীর্তি। এই পুস্তকটি তিন খন্ডে বিভক্ত। এর প্রথম খন্ডের নাম হচ্ছে-*মুকাদ্দিমা* বা উপক্রমনিকা। এ *মুকাদ্দিমার* মধ্যে তিনি ইতিহাসের যে বৈজ্ঞানিক, বস্তুতান্ত্রিক ও যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ দান করেছেন তা রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে তাঁকে স্থায়ী গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ইতিহাস সম্পর্কে তিনি ঐতিহ্যমুখী ঐতিহাসিকদের সমালোচনা করে বলেন, "ইতিহাস কেবল রাজা-বাদশাহর জয় পরাজয়, বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান-পতন, রাষ্ট্র বা ধর্মের কাহিনী নয়, ইতিহাস হচ্ছে মানুষের সামগ্রিক কার্যাবলীর বিবরণ, সভ্যতা বিকাশের ঘটনা পরম্পরার প্রকাশ। মানব সমাজের প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তা উপলব্ধি করা, তার যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করাই ঐতিহাসিকের কাজ।" এ পরিবর্তন নানা রকমের হয় এবং নানা ভাবে প্রকাশ পায়। নগর সামাজিকতায়, কিংবা ধর্মীয়,জাতীয় বা গোষ্ঠীসুলভ সংহতিতে। নতুন নতুন শ্রেণীর উত্থান, পতন, বিপ্লব, রাজ্যজয়, রাষ্ট্র গঠন বা রাষ্ট্র-পরিবর্তনই এর উদাহরণ। মানুষের আহার-বিহারের অভাব পূরণ, জীবন যাত্রার জন্য বিভিন্ন শিল্পকলার উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ সাধন এই পরিবর্তনেরই বহি:প্রকাশ। এই পরিবর্তন প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে হয় এবং এতে ব্যক্তি বিশেষের বড় একটা হাত নেই। তাঁর এ উক্তি থেকে স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, ইতিহাসের আধুনিক যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার সাথে খালেদুনের চিন্তাধারার যথেষ্ট মিল রয়েছে।

মানব সমাজের নির্ভূল ইতিহাস রচনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ

ইবনে খালেদুনের পূর্বে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা করেন, তার মধ্যে বাইবেলের কাহিনী, কিংবা খ্রিষ্টান সেইন্টদের অলৌকিক কার্যাবলীর বিবরণ স্থান পায় এবং খ্রিষ্টপূর্ব প্রাচীন সভ্যতাগুলোকে উপেক্ষা করে ইতহাস রচিত হয়। ইবনে খালদুনই সর্বপ্রথম ইতিহাসকে এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত করে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেন। ইতিহাস এমন একটি বিজ্ঞান যা সমাজ জীবনের গতি পরিবর্তন সম্পর্কে নিয়ম আবিস্কার করে। বস্তত: তাঁর এ সংজ্ঞা থেকেই আধুনিক যুক্তিবাদী ইতিহাস শাস্ত্রের সূচনা ঘটেছে।

তাঁর মতে, রাষ্ট্র ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ কোন অমানবীয় শক্তির অধীন নয়। তার মূল চালিকা শক্তি হলো কতগুলো নিয়ম যা সমাজের বাস্তব পরিস্থিতির ফল। এই নিয়মগুলো সর্বোতভাবে প্রযোজ্য ও কার্যকরী। স্থান ও কালের পার্থক্য সত্ত্বেও একই বাস্তব পরিবেশে ও অভিন্ন কাঠামোতে গঠিত সমাজে ঐতিহাসিক ক্রমপরিবর্তন একই নিয়ম অনুসরণ করতে বাধ্য।

সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা

সমাজ বিজ্ঞানের মূল সূত্রের ওপর ভিত্তি করে ইবনে খালদুন ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহকে বিচার বিশ্লেষনের চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস রচনা করার জন্য সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য। তাঁর মতে যে ঐতিহাসিক ইতিহাসকে সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না, তাঁর পক্ষে যথার্থ ইতিহাস রচনা করাও সম্ভব নয়। এ দৃষ্টিকোন থেকে তাঁর *'মুকাদ্দিমা'* গ্রন্থটি ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান এ উভয় জ্ঞানভান্ডারের একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত।

"যথার্থ বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস রচনা করার জন্য সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য।

ইবনে খালদুন তাঁর *মুকাদ্দিমায়* মানব সমাজের জীবনযাত্রার রীতি-নীতি উদ্ভাবনে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তব রূপায়ণে, আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতির প্রভাব কিভাবে প্রতিফলিত হয় তার বিজ্ঞানসম্মত ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। তিনি সমাজবিজ্ঞানকে ইতিহাসের একটি অতি গুরুতপূর্ণ শাখা হিসাবে আবিস্কার করেন এবং এভাবে তাঁর হাতে বিশ্ব ইতিহাসের দর্শন পূর্ণাঙ্গভাবে রূপায়িত হয়েছিল। মানবসভ্যতা সম্পর্কে খালদুনের ইতিহাস এক মৌলিক রচনা।

সমাজবিজ্ঞানের সূত্র ধরে ইবনে খালদুন অভিমত ব্যক্ত করেন যে, পৃথিবীর যে অংশ নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলে অবস্থিত সেখানে প্রধান প্রধান বিজ্ঞান ও কলার উদ্ভব হয় এবং ইতিহাসের খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ সে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অপরদিকে, যে সব দেশের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন, সে সব দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টি নিম্মমানের হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, মানুষের সাধারণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা পৃথিবীর দ্রাঘিমাংস ও অক্ষাংশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। আর তা মানুষের অভ্যাস ও রীতিনীতির উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। তার মতে যারা বিষুব রেখার নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে তারা অত্যধিক গরমের কারণে প্রগতি অর্জনের পথে বাধা প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে রোমান, পারসিয়ান ও গ্রীকদের ন্যায় যে সব জাতি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বসবাস করে, তারা সভ্যতা ও কৃষ্টির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী অবদান রাখতে সক্ষম হয়। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি মানব সভ্যতার গতি প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। নাগরিকদের আদর্শিক ঐক্যবোধ সমাজ সংহতি ও রাষ্ট্রশক্তিকে দৃঢ়তর করে। তিনি ইতিহাসে সমাজ বিজ্ঞানের মূলমূত্র প্রয়োগ করে ঘটনা প্রবাহকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

সারকথা

ইবনে খালদুন ইতিহাসকে সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি থেকে মুক্ত করে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভংগির সূচনা করেন। তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস রচনা করার জন্য সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি ইতিহাসকে দর্শনের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর যুক্তিবাদী ও বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসকে বাস্তবতার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। সর্বপ্রথম ইতিহাসে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেন কে?
(ক) সেন্ট অগাষ্টিন; (খ) টমাস একুইনাস;
(গ) কার্ল মার্কস; (ঘ) ইবনে খালদুন।

২। "ইতিহাস হচ্ছে মানুষের কার্যাবলীর বিবরণ"-এই উক্তিটি কে করেছেন?
ক। এঙ্গেলস; খ। লেনিন;
গ। মাওসেতুং; ঘ। ইবনে খালদুন।

৩। ইবনে খালদুন মানব সমাজের জীবন যাত্রার রীতি নীতি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আলোচনা করেন কোন গ্রন্থে?
ক। *মোকাদ্দিমায়;* খ। *দি স্পিরিট অব লজ;*
গ। *গভর্মেন্ট এন্ড পলিটিকস;* ঘ। *পৃথিবী প্রসঙ্গ।*

৪। বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস রচনা করার জন্য খালদুন কোন জ্ঞানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন?
ক। অর্থনীতি; খ। ইতিহাস;
গ। রাষ্ট্রনীতি; ঘ। সমাজ বিজ্ঞান।

উত্তরমালা : ১। ঘ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। ইতিহাসের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা বলতে ইবনে খালদুন কি বুঝিয়েছেন?

২। ইবনে খালদুন সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যের প্রতি কেন গুরুত্ব আরোপ করেছেন?

পাঠ-৯

হযরত মওলানা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রহ:) (১৭০৩-১৭৬৪)

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ❑ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ এর রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ❑ শরিয়তের বিধান সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভারতীয় উপমহাশের মুসলমানদের ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারের অগ্রনায়ক, প্রতিভাধর চিন্তাবিদ ও দার্শনিক মাওলানা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রহ:) ১৭০৩ সালে দিল্লীর এক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শাহ্ আব্দুর রহিম একজন প্রখ্যাত আলেম ছিলেন। বাদশাহ আওরঙ্গজেব ইসলামী কানুন বিধিবিধান সংকলনের জন্য যে পরিষদ গঠন করেন তাঁর পিতা মাওলানা শাহ আব্দুর রহিম (রহ:) ছিলেন ঐ পরিষদের একজন বিজ্ঞ সদস্য। পিতার তত্ত্বাবধানে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ কোরআন, হাদিস ও ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, ফিকাহ শাস্ত্র ও আধ্যাত্মিক সাধনায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর গভীর জ্ঞান ও পান্ডিত্যের জন্য তাঁকে ইমাম গাযালী (রহ:) সঙ্গে তুলনা করা হয়। তিনি আল কোরআনের তরজমা এবং হাদিসের উপর বিস্তারিত ভাষ্য রচনা করেন। *'তাফহীমাতে এলাহিয়া'* একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ওয়ালি উল্লাহর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ছিল প্রায় দুইশত। তিনি আজীবন তাঁর পিতা শাহ আব্দুর রহিমের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকাল সমাপ্তির পর থেকে মুসলমানদের নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে শরিয়ত পরিপন্থী নানা রকম রীতি নীতি ঢুকে পড়ে। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। ভারতে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম এবং ভিন্নধর্মীয়দের শাসনে ওয়ালী উল্লাহ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি দেখলেন ইসলাম বিরুদ্ধ বহু মতবাদ ও রীতিনীতি মুসলমান সমাজ ও ধর্মকে কলুষিত করছে। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুসলমান সমাজ থেকে অনৈসলামিক আচার প্রথা দূরকরে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর হন। তিনি সমাজে আল কুরআন নির্দেশিত বিধি বিধান প্রতিষ্ঠার পবিত্র সংগ্রামে অবতীর্ন হন। ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি নিজেকে আত্মনিয়োগ করলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় শপথ নেন।

রাষ্ট্রদর্শন

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ, যুক্তিদর্শন ও তত্ত্বদর্শনের সমন্বয়ে রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি রচনা করেন। তিনি রাজনৈতিক দর্শনকে আল কোরআনের ব্যবহারিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে, আল কোরআনে একটি বৈপ্লবিক আহব্বান রয়েছে। যে আহব্বান বিশ্বজনীন এবং বিশ্বমানবতার ক্ষেত্রে সুপ্রসারিত। যে কোন যুগে, যে কোন সমাজে এই বৈপ্লবিক নীতি অনুসরণ ও অনুকরণ করলে ইসলামের প্রাথমিক যুগের ন্যায় নবজাগরণ অবশ্যম্ভাবী। এবং তা হবে কোরআনের অর্ন্তনিহিত শক্তির বলেই। তিনি মানুষের ব্যবহারিক জীবনে পবিত্র কোরআনের শাশ্বত শিক্ষাকে বুনিয়াদরূপে গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এই শিক্ষার আলোকে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ উল্লেখ করেন যে, অর্থনৈতিক ভারসাম্যের অভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় দেখা দেয়।

আল কোরআনে একটি বৈপ্লবিক আহব্বান রয়েছে। যে আহব্বান বিশ্বজনীন এবং বিশ্বমানবতার ক্ষেত্রে সুপ্রসারিত।

তিনি রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে রূপরেখা উপস্থাপন করেছেন তাতে আদি ইসলামী শাসন ব্যবস্থার চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের জন্য বিভিন্ন ত্বরিকা বা পথ যেমন, শিয়া-

সুন্নী, হানাফি, হাম্বলি, ওয়াহাবি, ওয়াহাদাতুল, ওয়াদুদ, এবং ওয়াহদাতুল সহুদ প্রভৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধনে প্রয়সী হয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল একটি বিশ্বজনীন সমাজব্যবস্থার দিকে। তিনি গভীরভাবে উপলব্দি করেছিলেন যে, বহুধা বিভক্ত মানব সমাজ মানুষের জন্য কল্যাণকর নয়। তিনি পৃথিবীর সকল মুসলমানকে একটি কওম বা জাতির সদস্য বলে উল্লেখ করেছেন। শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ গোটা মানব সমাজকেই তার সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর আহব্বান ছিল সার্বজনীন মানবতার প্রতি ।

শাহ্ ওয়াল উল্লাহ গোটা মানব সমাজকেই তার সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য করেছিলেন

শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ '*তাসাউফের বাইয়ত'কে*, রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নিকট 'তাসাউফের বাইয়াত গ্রহণের অর্থ ছিল রাজনৈতিক মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ। এ কারণেই তিনি রাজনীতিতে তাসাউফ দর্শনকে প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মক্কা ও মদীনায় অবস্থানকালে তিনি ইজতিহাদের উপযোগী পূর্ণ যোগ্যতা অর্জ্জন করেছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিকভাবে হযরত মুহাম্মদ (স:) থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, কোরআনের বিপ্লব পুর্নবার আনার জন্য হযরত মুহাম্মদ (স:) এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের জীবন যাত্রা প্রানালী এবং তৎকালীন সমাজব্যবস্থা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে হবে। তিনি মক্কা-মদীনার ইসলামী আন্দোলনের আদর্শকে সামনে রেখে সংস্কার বিপ্লব শুরু করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন। তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করে তার বৈপ্লবিক কর্মসূচি অনুসারে প্রথমে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল ফারসী ভাষায় আল কোরআনের পূর্ণাঙ্গ তরজমা করা। এই তরজমার নাম '*ফতেহোর রহমান।*'

শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ ইসলামের পতনের জন্য রাজতন্ত্রকে দায়ী করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, যতদিন খলিফাতন্ত্র বিদ্যমান ছিল ততদিন ইসলামের গৌরব অম্লান ছিল। আর এজন্যই তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের আলোকে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নেতাকে অবশ্যই জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তিনি জাহেরী বা প্রকাশ্য জ্ঞান এবং বাতেনী বা অপ্রকশ্য জ্ঞান এ দুইটি জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেন। এই উভয় প্রকার জ্ঞানে যিনি সিদ্ধি লাভ করেছেন তিনিই আদর্শ মানব। ইসলামকে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে জাহেরী ও বাতেনী উভয় জ্ঞান আয়ও করতে হবে।

তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের আলোকে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

শরীয়তের বিধান

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ ইসলামী বিধিবিধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর পরিকল্পিত রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে শরিয়তের বিধান।তিনি কোরআনের পরিপন্থী বিধিবিধানের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেন যে, রাষ্ট্র পরিচালিত হবে শরিয়তের বিধান মোতাবেক। রাষ্ট্রনেতা বা আইন প্রনেতাগণ যে আইন রচনা করবেন তা অবশ্যই কোরআন ভিত্তিক হতে হবে। শাসকের আইন যদি শরিয়তের পরিপন্থী হয় তা অগ্রাহ্য করার অধিকার জনগণের আছে। আইন বলতে বুঝায় কোরআন বা শরিয়তের বিধান। যুক্তি ও প্রজ্ঞার আলোকে যে আইন তৈরী হয় তাকে ইজতিহাদ বলা হয়। কোন আইন শরিয়ত বা কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক রচিত হয়েছে কিনা তা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ বিচার বুদ্ধি ও যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেবেন। তাঁর মতে শরিয়তের বিধান দ্বারাই চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন হয়ে থাকে। মানুষের কল্যাণ ও উন্নতির জন্যই এসব বিধান তৈরী করা হয়েছে।

রাষ্ট্র পরিচালিত হবে শরিয়তের বিধান মোতাবেক

সারকথা

শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ সমাজ থেকে ইসলাম সম্মত নয় এমন আচার-প্রথা দূর করে পরিপূর্ণ ইসলামী সামাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ (স:) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আলোকে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর পরিকল্পিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। গভীর জ্ঞান ও পান্ডিত্যের জন্য শাহ্ ওয়ালী উল্লাকে কার সঙ্গে তুলনা করা হয়?
(ক) এরিস্টটল; (খ) প্লেটো;
গ। আল ফারাবী; (ঘ) ইমাম গাযযালী।

২। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কত ?
(ক) একশত; (খ) প্রায় দুইশত;
(গ) দুইশত; (ঘ) তিনশত।

৩। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ হেজাজে কার নিকট শিক্ষা লাভ করেন?
(ক) শাহ্ আবু তাহির; (খ) ঈমাম আবু হানিফা;
(গ) ঈমাম বোখারী; (ঘ) মাওলানা রুমী।

৪। শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাজনীতিতে কোন দর্শনকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন?
ক। ইবনুল আরাবীর দর্শন; খ। ইমাম গাযালীর দর্শন;
গ। ইবনে খালদুনের দর্শন; ঘ। তাসাউফের দর্শন।

৫। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর মতে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে কিভাবে?
ক। কোরআন অনুযায়ী; খ। হাদিস অনুযায়ী;
গ। শরিয়ত মোতাবেক; ঘ। ফিকাহ্ মোতাবেক।

উত্তরমালা - ১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। ঘ ৫। গ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। তাসাউদের বাইয়াত বলতে কি বুঝায়?
২। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর পরিকল্পিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহর রাষ্ট্রদর্শন আলোচনা করুন।